বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন দেখা দিতো তখনই সংশ্লিষ্ট সুধীজনকে ডেকে 'দারুন্নাদওয়া'তে বসেই তারা উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই গৃহে একমাত্র কুরাইশী ছাড়া অন্য কারও জন্যে প্রবেশের অধিকার ছিল না। সেই গৃহে আবূ জাহ্‌লের প্রবেশাধিকার ছিল। এরা সপ্তাহে একদিন রোজ শনিবার সমবেত হতো। এজন্যেই লোকমুখে একথা শ্রুত হয় যে, 'সপ্তাহের শনিবার হচ্ছে ধোকা ও প্রতারণার দিন।' অভিশপ্ত ইবলীসও এক বৃদ্ধের বেশে সেই সভায় উপস্থিত হয়। বড় গাম্ভীর্য সহকারে মোটা কম্বল ও রেশমের টুপি পরিধান করে দরজার সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান। সকলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলেছে,—'আমি 'নজদ' এলাকার একজন প্রবীণ ও বহুদর্শী ব্যক্তি। আপনারা যে ব্যাপারের পরামর্শ করতে বসেছেন, আশা করি আমি আপনাদেরকে সে ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ ও উত্তম পন্থা বলে দিতে পারবো।' এ কথা শুনে তারা সকলেই শয়তানকে বসতে অনুমতি দেয়। বসার সুযোগ পেয়ে শয়তান নিজেই পরামর্শ কার্য পরিচালনা করতে লাগলো।

মুহাম্মদ তাদের ধর্মের অশেষ ক্ষতি করেছে। সুতরাং এ অবস্থায় তাদের কি করা উচিত। সমবেত একশত লোকের মধ্যে—মতান্তরে পনের জনের মধ্যে—আবুল-বুহ্‌তারী (পরবর্তীতে সে বদরযুদ্ধে নিহত হয়েছে) প্রস্তাব করলো,—'তাকে লোহার বেড়ী পরিয়ে বন্দী করে রাখা হোক। অতঃপর দেখ—তার মত আরও অন্যান্য কবিদের যে দশা হয়েছে, তারও তাই হবে।' বৃদ্ধ বললো,—'না ; তবে সর্বনাশ! লোহার জিঞ্জীর দিয়ে বেঁধে তোমরা তাকে বন্দী করে রাখবে সে অপর এক দরজা দিয়ে বের হয়ে তার ভক্তদের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। অতঃপর সদলবলে সে তোমাদের উপর হামলা করবে, তোমাদের ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। অল্পদিনে তার শিষ্যসংখ্যা যখন বেড়ে যাবে, তখন তোমাদের উপর চড়াও করে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে ফেলবে।' সুতরাং এ প্রস্তাব তেমন কোন মঙ্গলজনক প্রস্তাব নয় ; অন্য কোন তদবীর চিন্তা কর।

আসওয়াদ ইব্‌নে রবীয়া বললো,—'তাকে দেশ হতে বিতাড়িত করা হউক।' বৃদ্ধ শয়তান বললো,—'না ; এটাও হতে পারে না। কারণ, একে মদীনায় তার প্রচারকার্য খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। এরপর সে নিজে গিয়ে

কাজ আরম্ভ করলে তার মধুর ব্যবহার ও ভাষার যাদুক্রিয়ায় অতি অল্পদিনে তার শিষ্যসংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে যাবে। তখন সদলবলে সে তোমাদের উপর হামলা করে তোমাদের রাজত্ব ছিনিয়ে নিবে।. অতঃপর তোমাদের সাথে যাচ্ছে তা' ব্যবহার করবে ; অথচ তখন তোমাদেরও করার কিছু থাকবে না। সুতরাং এ ছাড়া অন্য কোন প্রস্তাব পেশ কর।'

আবূ জাহল প্রস্তাব করলো,—'তাকে হত্যা করা হোক। প্রত্যেক গোত্রের পক্ষ হতে একজন করে যুবক আসবে এবং সকলে মিলে একযোগে তাকে হত্যা করবে। তা'হলে বনী আবদে মুনাফ আরবের সকল গোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সাহস পাবে না। বড়জোর হত্যার জরিমানা বাবদ একশত উটের দাবী করবে ; এটা আদায় করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়।' শয়তান ইবলীস এই প্রস্তাবের প্রশংসা করে দৃঢ় সমর্থন জানালো। অন্যান্যরাও উক্ত প্রস্তাবকে সমর্থন করে হত্যাকার্য সমাধা করার উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। সিদ্ধান্ত হলো যে, একদিন মধ্যরাত্রিতে এ কাজ সমাধা করা হবে।

এদিকে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে তাদের কুমন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সবকিছু জানিয়ে আরজ করলেন যে, অদ্য রাত্রিতে আপনি স্বীয় শয্যায় রাত্রিযাপন করবেন না।

এদিকে মুশরিকরা নির্দিষ্ট রাত্রিতে নিজেদের হীন আশা পূর্ণ করার মানসে নানা অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নবীজীর বাসগৃহ বেষ্টন করে ফেলে। উদ্দেশ্য, যখনই দরজা খুলে তিনি বের হবেন, অমনি একযোগে সকলে তাঁকে আক্রমণ করবে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)-কে নবীজীর বিছানায় নবীজীর চাদরে—যে চাদর গায় দিয়ে তিনি জুমা ও দুই ঈদের নামায পড়াতেন—শরীর ঢেকে দিয়ে শুইয়ে দিলেন। বস্তুতঃ হযরত আলী (রাযিঃ)-ই প্রথম সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর দ্বীন ও নবীর হিফাযতের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পূর্ণভাবে উদ্যত হয়েছেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং হযরত আলী (রাযিঃ) কবিতা রচনা করেছেন, তার কয়েকটি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

وَقَيْتُ بِنَفْسِي خَيْرَ مَنْ وَطِئَ الثَّرَى
وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَبِالْحَجَرِ

'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ; খোদার ঘর তওয়াফকারী ও হজরে-আসওয়াদ চুম্বনকারীদের শ্রেষ্ঠ মানবের হিফাযতে আমি আমার জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছি।'

رَسُولُ اِلٰهٍ خَافَ اَنْ يَمْكُرُوا بِهِ
فَنَجَاهُ ذُو الطَّوْلِ الْاِلٰهُ مِنَ الْمَكْرِ

'তিনি আল্লাহর প্রেরিত মহান রাসূল, শত্রুর চক্রান্তের তিনি প্রবল আশংকা করেছেন ; কিন্তু মহা শক্তিমান আল্লাহ্ নিজেই তাঁকে হিফাযত করেছেন।'

وَبَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي الْغَارِ اٰمِنًا
مُوَقًّى وَفِي حِفْظِ الْاِلٰهِ وَفِي سِتْرِ

'ছওর গুহায় পূর্ণ নিরাপত্তায় তিনি যখন রাত্রিযাপন করেছেন, তখন খাসভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হিফাযতের পর্দায় আবৃত রেখেছিলেন।'

وَبِتُّ اُرَاعِيهِمْ وَمَا يُتَهِّمُونَنِي
وَقَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى الْقَتْلِ وَالْاَسْرِ

'আমি প্রতি মুহূর্তে শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রেখেছি এবং তারা আমার ব্যাপারে কি পরিকল্পনা নিচ্ছে, তাও লক্ষ্য করেছি। বস্তুতঃ সেই রাত্রিতে নিহত অথবা বন্দী হওয়ার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম।'

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজা খুলে বের হয়ে আসলেন। আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের চোখে আবরণ টেনে দিয়েছিলেন ; কেউ

কিছুই ঠাহর করতে পারলো না। নবীজীর হাতে এক মুষ্টি মাটি ছিল। তিনি তখন আবৃত্তি করছিলেন 'সূরা ইয়াসীন'। فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (আমি তাদের চোখে পর্দা এঁটে দিয়েছি, কাজেই তারা দেখে না) পর্যন্ত তিলাওয়াত করে হাতের মাটি তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। এই মাটি তাদের চোখে-মুখে গিয়ে পড়ে এবং তারা কোন কিছু দেখতে অসমর্থ হয়। আর নবীজী ইচ্ছানুযায়ী তাদের সম্মুখ দিয়ে নিরাপদে তশরীফ নিয়ে গেলেন। পরে একজন পথিক তাদের সমবেত হওয়ার কারণ জানতে পেরে বললো,—'তোমরা বৃথা এখানে বসে আছো ; খোদার কসম, তিনি তোমাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে চলে গেছেন এবং তোমাদের প্রত্যেকের মাথার উপর মাটি ছুঁড়ে গেছেন।' এ কথা শুনে সকলেই মাথায় হাত দিয়ে দেখলো, সত্য সত্যই প্রত্যেকের মাথায় তখনও মাটি রয়েছে। তারপর তারা গৃহে উঁকি দিয়ে দেখলো, একজন বিছানায় শুয়ে আছে, নবীজীর চাদর দিয়ে তার গাত্র আচ্ছাদিত। এরূপ দেখে তারা বলতে লাগলো, না ; আমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে আছে। অতঃপর পূর্বানুরূপ তারা অপেক্ষা করতে লাগলো। ভোর সকালে যখন হযরত আলী (রাযিঃ) সেই বিছানা থেকে গাত্রোত্থান করলেন, তখন তাদের ভুল ভাঙ্গলো ; বলতে লাগলো,—'রাতের পথিক আমাদেরকে ঠিকই বলেছিল।' এ ঘটনাকে লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ

'আর কাফেররা যখন প্রতারণা করতো আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশে।' (আনফাল ঃ ৩০)

কবির ভাষায় ঃ

لَا تَجْزَعَنَّ فَبَعْدَ الْعُسْرِ تَيْسِيْرُ
وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ وَقْتٌ وَتَقْدِيْرُ

'আপনি বিচলিত হবেন না ; কেননা কষ্টের পরেই স্বস্তি রয়েছে এবং প্রতিটি কার্য ও বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে।'

وَلِلْمُقَدِّرِ فِي أَحْوَالِنَا نَظَرٌ
وَفَوْقَ تَدْبِيرِنَا لِلّٰهِ تَدْبِيرٌ

'তকদীরের মালিক আল্লাহ্ তা'আলার আমাদের অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রয়েছে ; বস্তুতঃ তাঁর কুদরত ও তদবীরের কার্যকারিতা আমাদের সকল চেষ্টার উর্ধ্বে।'

এখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীজীকে হিজরত করার আদেশ দিলেন ; ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَاجْعَلْ لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

'বলুন ঃ হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে। আর দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে এমন বিজয়, যার সাথে আপনার সাহায্য থাকে।' (ইস্‌রা ঃ ৮০)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ 'হিজরতের হুকুমের সাথে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ)-কে সফরসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতেও হুকুম করা হয়েছিল।'

হাকেম (রহঃ) হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—হিজরতে আমার সফরসঙ্গী কে হবে? হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বলেছিলেন ঃ 'আবু বকর'। অতঃপর নবীজী হযরত আলী (রাযিঃ)-কে বিষয়টি জানিয়ে দেশের বহুলোকের আমানত একটি একটি করে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'আমরা চল্‌লাম—তুমি থাক ; সকলের আমানত পাওনা-দেনা বুঝিয়ে দিয়ে তুমিও চলে এসো।'

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ 'হিজরতের সেই দিনটিতে আমরা হযরত আবু বকরের গৃহে ছিলাম। সময়টা ছিল দ্বি-প্রহর, প্রচণ্ড গরম পড়ছিল তখন।

তাব্‌রানী কিতাবে হযরত আস্‌মা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে,—'হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সকালে-বিকালে দু'বার

আমাদের বাড়ী আসতেন। কিন্তু সেইদিন দুপুর বেলা হঠাৎ তাঁর আগমনে আমরা বিচলিত ও স্তম্ভিত হলাম। আমি বল্‌লাম,—'আব্বাজান! ওই যে নবীজী আসছেন, মাথায় রোমাল ঢাকা দিয়ে।' হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বললেন,—'প্রিয় নবীজীর জন্য আমার মা-বাপ কুরবান ; এ সময় তিনি অবশ্যই কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আসছেন।'

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ী আগমনপূর্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ) তাঁকে চৌকিতে উপবেশন করালেন। এবার নবীজী বললেন ঃ 'আবু বকর! আপনার সাথে গোপন আলাপ আছে ; সুতরাং আপনি একা থাকুন।' হযরত আবু বকর আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ হুযূর! এরা তো আপনার আপন জন ; এই আয়েশা ও আসমা ছাড়া এখানে আর কেউ নাই। অপর রেওয়ায়াতে আছে,—'এরা তো আমারই সন্তান।' অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হিজরতের জন্য আল্লাহ্‌র আদেশ পেয়েছি। তৈরী হউন ; আপনি সফরসঙ্গী।' হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বললেন,—'আমি পূর্ব হতেই প্রস্তুত হয়ে আছি এবং এ উদ্দেশে দু'টি তাজা উষ্ট্রীও খরিদ করে রেখেছি ; তন্মধ্যে আপনার যেটি পছন্দ হয় গ্রহণ করুন।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,—'আমি এর মূল্য পরিশোধ করে নিবো।' বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে হুযূরের উদ্দেশ্য ছিল হিজরতের ন্যায় মহামূল্য ইবাদত জান-মাল উভয়টার দ্বারা সম্পন্ন করে পরিপূর্ণ ফযীলত হাসিল করা।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ আমরা অতি শীঘ্র প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করে দিলাম ; চামড়ার এক থলিতে খাবারের ব্যবস্থা করে দিলাম।' ওয়াকেদীর বর্ণনামতে সেই খাদ্য ছিল বকরীর গোশত।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ 'অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাযিঃ) 'ছওর' পাহাড়ের এক গুহায় আত্মগোপন করলেন। তাঁরা তিনদিন সেই গুহায় অবস্থান করেছিলেন। 'ছওর' মক্কার অদূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। 'ছওর ইব্‌নে আবদে মুনাফ' নামক এক ব্যক্তি কোন কালে এই গুহায় অবতরণ করেছিল। তা' থেকেই এই পাহাড়ের নামকরণ হয় 'ছওর'।'

বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর (রাযিঃ) বাড়ীর পশ্চাৎদিকের একটি জানালার পথে বের হয়ে 'ছওর' পাহাড়ের অভিমুখে রওনা হয়ে যান। আবূ জাহ্‌ল তখন তাঁদের পার্শ্ব দিয়ে গা ঘেঁষে পথ অতিক্রম করছিল ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন, সে কিছুই ঠাহর করতে পারে নাই। নির্বিঘ্নে তাঁরা গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হলেন।

আবূ বকর তনয়া আসমা (রাযিঃ) বলেন,—'আমার পিতা পাঁচ হাজার দিরহাম সঙ্গে নিয়ে বাড়ী হতে বের হয়েছেন। কুরাইশীরা তাকে বাড়ীতে না পেয়ে আশে-পাশে চতুর্দিকে উন্মত্ত হয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিল। প্রত্যেক পথে কিছুসংখ্যক লোক তাঁদের অন্বেষণে পাঠিয়ে দিল। পদচিহ্ন বিশারদ কতিপয় লোক নবীজীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে ছওর গুহা পর্যন্ত পৌঁছে। এরপর আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। অথচ নবীজী তখন সেই গুহাতে আত্মগোপন করে ছিলেন। কিন্তু তাদের মনে সেই গুহাতে খোঁজ করার চিন্তাই উদিত হয় নাই। অবশেষে এই চরম ব্যর্থতায় উদ্বিগ্ন হয়ে ঘোষণা করলো যে, 'মুহাম্মদ ও আবূ বকরকে যে ব্যক্তি ধরে আনতে পারবে তাকে মাথাপিছু একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে।'

বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর (রাযিঃ) ছওর গুহায় প্রবেশের পর তাদের হিফাযতের জন্য আল্লাহ তা'আলা গুহামুখে উম্মে গায়লান নামক একটি বৃক্ষ উৎপন্ন করে দিলেন। ফলে কাফেরদের দৃষ্টি গুহাভ্যন্তরে পৌঁছতে পারে নাই। সেইসঙ্গে আল্লাহর অপার মহিমা! একটি বড় মাকড়সা গুহামুখে ঘন জাল বুনে দেয়। এর অব্যবহিত পর ভোরের দিকে এক জোড়া কবুতর কোথা হতে এসে বাসা বাঁধে এবং ডিম দিয়ে সেখানেই বসে যায়। আল্লাহ্‌র নবী ও তাঁর সফরসঙ্গী আবূ বকরের হেফাযত করার এটা ছিল একটি কুদরতি উপায়। কথিত আছে—হেরেম শরীফে অবস্থানরত কবুতরগুলো সেই কবুতর জোড়ারই বংশোদ্ভুত।

ইতিমধ্যে কাফেররা ছওর পাহাড়ের সব জায়গা বিশেষ করে গুহাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলো—বাকী শুধু এই গুহাটি। তাদের সাথে লাঠি সোঁটা, ঢাল-তলোয়ার সবই ছিল। এই গুহাটির মুখে মাকড়শার অক্ষত জাল, তদুপরি কবুতর দুইটি দেখে ভাবলো—ভিতরে কেউ নাই। একজন বললো, ভিতরে

প্রবেশ করেই দেখা যাক কেউ আছে কিনা। নবীজী তাদের এসব কথা শুনছিলেন। গুহার উক্তরূপ অবস্থা দেখে উমাইয়া ইব্‌নে খলফ বললো,—এর ভিতরে তারা থাকতে পারে না। কারণ, কেউ এই গুহায় প্রবেশ করলে মাকড়সার জাল কি আর আস্ত থাকতো? আর বন্য কবুতরই কি এখানে বাসা বেঁধে ডিম দিতো? কেউ কেউ বললো ঃ 'এই জাল আমি মুহাম্মদের জন্মের পুর্ব থেকেই দেখে আসছি।' অবশেষে নিরাশ হয়ে তারা ফিরে যায়। বস্তুতঃ এ ছিল আল্লাহ্‌র কুদরতের বিকাশ, যা শত্রুপক্ষকে সৈন্য-সামন্তের সাহায্যে পরাভূত করার চাইতে অনেক উর্ধ্বের কথা। আল্লাহ্ তা'আলা একটি উদ্ভিদের ছায়া ও অতি দুর্বল ও একান্ত নিরীহ দুইটি মূক প্রাণীর দ্বারা এত প্রবল ও পরাক্রমশালী দুর্দান্ত অসুরদের এরূপে পরাজয় ঘটান। কবি ইব্‌নে নকীবের ভাষায় ঃ

وَدُوْدُ الْقَزِّ اِنْ نَسَجَتْ حَرِيْرَاه يَجْمُلُ لِبْسُهُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ فَاِنَّ

الْعَنْكَبُوْتَ اَجْمَلُ مِنْهَاه بِمَا نَسَجَتْ عَلٰى رَأْسِ النَّبِيِّ -

'বুননকৌশলী রেশম পোকার বুনা রেশমী সূতার দ্বারা তৈরী বস্ত্রের সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোহারিত্বপূর্ণ ; কিন্তু মাকড়সা ঐ রেশম পোকার চাইতেও অনেক বেশী মর্যাদাপূর্ণ। কারণ, ছওর গুহায় মাকড়সার বুনা জাল প্রিয় নবীজীর হিফাযতে তাঁর পবিত্র মাথার উপর শোভা পেয়েছিল।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে,—হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ) বলেন ঃ 'গুহামুখে দাঁড়িয়ে যখন কাফেররা জল্পনা কল্পনা করছিল, তখন আমি বিচলিত হয়ে হুযূরের নিকট আরজ করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা যদি একটু নীচের দিকে তাকায়, তা'হলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিচল ও প্রশান্ত চিত্তে বললেন ঃ

مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا -

'যে দুইয়ের সাথে তৃতীয় সত্তা খোদ আল্লাহ্ পাক রয়েছেন, তাদের কোন ভয় নাই।'

সীরাতবেত্তাগণ লিখেছেন,—'হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) বিচলিত হয়ে উক্তরূপ আশংকা প্রকাশ করার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'এরা যদি আমাদেরকে দেখে ফেলে, তা'হলে আমরা এদিকে বের হয়ে যাবো। হযরত আবূ বকর তাকিয়ে দেখেন, গুহার অপরদিকে খোলা পথ রয়েছে, অদূরেই সমুদ্র তীরে নৌকা ও মাঝি মাল্লা সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় অপেক্ষমান।'

হযরত হাসান বসরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে,—'হিজরতের রাত্রিতে পথ অতিক্রমকালে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) কখনো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগ্রে আবার কখনো পশ্চাতে চলছিলেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,- 'আমার আশংকা হয়—দুশমন ওঁত পেতে সম্মুখে বসে আছে ; তখন আমি আপনার সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়ে যাই।' হুযুর বললেন ঃ 'হে আবূ বকর ! তা'হলে কি তুমি কামনা কর যে, অনিবার্য কোন বিপদে আমার স্থলে তুমিই নিহত হও ?' হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) কসম করে বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এটি আমি অবশ্যই কামনা করি।'

'ছওর' গুহার নিকটবর্তী হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি অপেক্ষা করুন ; আমি গুহার অভ্যন্তরভাগ পরিস্কার করে নিই।' পর্বত-গুহা ; জনমানবের চলাচল সেখানে ছিল না। ছিদ্রের ফাঁকে ফাঁকে সাপ-বিচ্ছু থাকাও বিচিত্র নয়। তাই নবীজীকে গুহার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে হযরত আবূ বকর প্রথমে গুহায় প্রবেশ করলেন। কোথাও কিছু না পেয়ে গায়ের চাদর ছিড়ে গর্তগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তবুও একটি ছিদ্র কাপড়ের অভাবে বাকী থেকে যায়। হযরত আবূ বকর নিজের পায়ের গোড়ালী সেই ছিদ্রের মুখে রেখে নবীজীকে গুহার ভিতরে প্রবেশ করতে ডাকলেন। নবীজী গুহায় প্রবেশ করলেন এবং আবূ বকরের উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন।

ক্লান্ত দেহখানি এলিয়ে দিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ হযরত আবূ বকর অনুভব করলেন, খোলা গর্তটির ছিদ্রপথে রক্ষিত পায়ে কিসে যেন দংশন করলো। দংশনের বেদনা ক্রমেই তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুললো। অসহ্য বেদনায় তাঁর সারাটি দেহ বিষে

জর্জরিত হয়ে উঠলো। তথাপি প্রিয় নবীজীর ঘুমে ব্যাঘাত হবে, তাই তিনি একটুও নড়া-চড়া কিংবা আহা-উহু পর্যন্ত করছিলেন না। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও ভীষণ বেদনার দরুন তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো একেবারে আঁ-হযরতের চেহারা মুবারকের উপর। প্রিয় নবীজীর নিদ্রা তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হয়ে গেল। আবূ বকর জানালেন, তাকে সাপে দংশন করেছে। নবীজী নিজের মুবারক থুথু ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষের অসহ্য যন্ত্রণা শেষ হয়ে গেল। আবূ বকর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মক্কা নগরী থেকে বৃহস্পতিবার দিন প্রস্থান করেছিলেন। তিন দিন 'ছওর' গুহায় অবস্থান করার পর সোমবার দিন সেখান থেকে বের হয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হন। তখন সময়টা ছিল রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম দিক। এভাবে তিনি ১২ই রবীউল আউয়াল রোজ শুক্রবার পবিত্র মদীনা-মুনাওয়ারায় গিয়ে পৌঁছেন।

যাকারিয়া নামক জনৈক বুযুর্গের অন্তিম সময়ে তার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট এক বন্ধু কালেমা তাইয়্যেবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه তালক্বীন করে তাকে পাঠ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু সেই বুযুর্গ তা পাঠ না করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি পুনরায় তালক্বীন করেন। এবারও সেই বুযুর্গ মুখ ফিরিয়ে নেন। যখন তৃতীয় বার তালক্বীন করলেন, তখন তিনি স্পষ্ট অস্বীকার করে বললেন ঃ 'না'। এতে বন্ধু অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর বুযুর্গের জ্ঞান ফিরে আসলে চক্ষু উন্মীলন করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা কি আমাকে কিছু পড়তে বলেছিলে? বন্ধু বললেন ঃ 'হাঁ, আপনাকে কালেমা পড়ার জন্য তিনবার উদ্বুদ্ধ করেছি, দুইবার আপনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তৃতীয়বার স্পষ্ট অস্বীকার করে 'না' বলে দিয়েছেন।' বুযুর্গ বললেন ঃ প্রকৃত ঘটনা এই যে, অভিশপ্ত ইবলীস এক পেয়ালা পানি হাতে নিয়ে আমার শিয়রে দাঁড়ানো ছিল। বারবার সে পাত্রটিকে নড়া-চড়া দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল পানির প্রয়োজন আছে কি? আমি প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করলে সে আমাকে বলছিল 'তা'হলে তুমি একথা সাক্ষ্য দাও যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র।' তখন আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। পুনরায় সে আমার দিকে

এসে সেই কথাই বললো। তখনও আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তৃতীয়বার যখন সে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলো, তখন আমি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বলেছি ঃ 'না' কিছুতেই আমি তা' সাক্ষ্য দিবো না। তারপর শয়তান পেয়ালাটি যমীনের উপর সজোরে নিক্ষেপ করে পলায়ন করেছে। সুতরাং তোমাদের তালক্বীনের সময় আমি আসলে শয়তানের প্রতারণাকে প্রত্যাখ্যান করছিলাম ; তোমাদের তালক্বীন বা কালেমা তাইয়্যেবাকে নয়। শুন, আমি এখনও সাক্ষ্য দিচ্ছি,—'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ)–এর সূত্রে বর্ণিত আছে,– এক ব্যক্তি শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রতারণার প্রক্রিয়া–প্রণালী সম্পর্কে জানতে চেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্বপ্নযোগে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার পদ্ধতি এভাবে দেখিয়েছেন যে, কাঁচের মত স্বচ্ছ–পরিস্কার দেহের অধিকারী একজন লোক, যার ভিতর–বাহির সব স্পষ্ট দেখা যায়, তার ভিতরে দেখা গেল— শয়তান একটি ব্যাঙের আকৃতিতে তার কাঁধ ও কানের মধ্যবর্তী স্থানে বসে আছে এবং তার একটি সুদীর্ঘ শুঁড় রয়েছে। শুঁড়টিকে সে লোকটির অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়ে তাকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। যখনই লোকটি আল্লাহ্‌র যিকর করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায়।

আয় আল্লাহ্! শয়তান থেকে আমাদেরকে পানাহ দিন। বিদ্বেষী ব্যক্তির প্রভাব থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখুন। আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আমাদেরকে যিকর ও শোকর করার তাওফীক দান করুন।

অধ্যায় ঃ ১৭

আমানত ও তওবা

মুহাম্মদ ইব্‌নে সেকান্দর (রহঃ) থেকে বর্ণিত,—তিনি বলেন ঃ একদা আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) একদা পবিত্র কা'বা ঘর তওয়াফ করার সময় দেখলেন, একজন লোক পদে পদে কেবল হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পড়ছে। হযরত সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন,—'তুমি অন্যান্য তাসবীহ–তাহলীল না পড়ে কেবল দরূদ শরীফ পাঠ করছো ; এর কারণ কি? এ ব্যাপারে কি তোমার বিশেষ কোন ঘটনা আছে?' লোকটি হযরত সুফিয়ানের পরিচয় জেনে বললো ঃ 'আপনি যদি দেশের খ্যাতনামা বুযুর্গ না হতেন, তা'হলে এ রহস্য সম্পর্কে আপনাকে কিছুই বলতাম না। শুনুন,—'একবার আমি আমার পিতার সাথে পবিত্র কা'বাঘর তওয়াফের উদ্দেশে বের হই। পথে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে মারা যান। মৃত্যুর পর তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমি إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়ার পর তার চেহারা বস্ত্রাবৃত করে রেখে দিই। কিছুক্ষণ পর আমি বিষন্ন মনে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ি। তখন স্বপ্নে দেখি,—অত্যন্ত সুশ্রী–সুদর্শন, পরিস্কার–পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত একজন লোক,—যার শরীর থেকে খোশবূ চতুর্দিকে মোহিত হয়ে পড়ছিল—আমার পিতার নিকট এসে চেহারার উপর রক্ষিত চাদর সরিয়ে মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে, আমার পিতার চেহারা দিব্যি পরিস্কার ও সফেদ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি প্রস্থান করতে উদ্যত হলে আমি তাঁর হাত ধরে বললাম,—'আমি আপনার পরিচয় জানতে চাই, যার ওসীলায় আল্লাহ তা'আলা এই সফরে আমার পিতার উপর এক বড় অনুগ্রহ করেছেন, তাঁকে আমি চিনতে চাই।' তিনি বললেন ঃ 'তুমি আমাকে চিনো না? আমিই তো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), পবিত্র কুরআন আমারই উপর নাযিল হয়েছে। তোমার পিতা বহু অন্যায়–অপরাধ করে নিজের উপর জুলুম করেছে ; কিন্তু সে নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে আমার উপর দরূদ পড়তো।

এই বিপদের সময় সে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। আর আমি আমার প্রতি দরূদ পাঠকারীকে সাহায্য করে থাকি।' অতঃপর আমি জাগ্রত হই এবং দেখি, পিতার চেহারা সম্পূর্ণ শুভ্র, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।'

আমর ইব্‌নে দীনার আবু জা'ফরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ نَسِيَ الصَّلٰوةَ عَلَيَّ فَقَدْ اَخْطَأَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ ـ

'আমার প্রতি যে দরূদ পাঠ করে না, সে জান্নাতের বিপরীত পথে চলছে।'

'আমানত' (امانت) শব্দটি আম্‌ন (امن) ধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে, মুক্ত থাকা, নিশ্চিন্ত হওয়া। বস্তুতঃ 'আমানতে'র গুণে অলংকৃত ব্যক্তি বাতিলের কলুষতা হতে মুক্ত-পবিত্র এবং হকের উপর নিশ্চিন্তে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'খিয়ানত'(خيانت), যা 'ক্রটি' ও 'দোষ' এর অর্থবোধক 'খুন' (خون) ধাতু হতে নির্গত। বস্তুতঃ খিয়ানতের মাধ্যমে কলুষমুক্ত একটি বস্তুকে ক্রটিপূর্ণ ও দুষ্ট করে দেওয়া হয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে 'আমানত' ও 'খিয়ানত' নামকরণের তাৎপর্য এখানেই।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ ـ

'ধোকা, প্রতারণা ও খিয়ানতের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ
فَهُوَ مِمَّنْ كَمُلَتْ مُرُوْءَتُهٗ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهٗ وَوَجَبَتْ اُخُوَّتُهٗ ـ

'যে ব্যক্তি লোকজনের সাথে মেলামেশা করা সত্ত্বেও কারও উপর জুলুম বা বে-ইনসাফী করে না, অনুরূপ মানুষের সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কখনও মিথ্যা ও খিয়ানতের আশ্রয় নেয় না, এমন ব্যক্তি বস্তুতঃই

পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী, সততা ও মহত্ত্বগুণ তার স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য। এহেন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করা চাই।'

মরু-আরবের জনৈক বেদুঈন লোক একটি গোত্রের প্রশংসা করে বলেছিল,—'এরা আমানত ও সত্যের সংরক্ষণে উম্মাদ-অনুরাগী, অঙ্গীকার ও ওয়াদা-ভঙ্গের কল্পনাও তারা করে না, কোন মুসলমানকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কোন ক্রটি করে না, তাদের দায়িত্বে কারও কোন হক বা পাওনা অবশিষ্ট নাই,তারা এবংবিধ বহু চমৎকার গুণাবলীর অধিকারী।' আফসূস! বেদুঈনের প্রশংসিত সেই লোকেরা আজ দুনিয়াতে নাই ; পরন্তু আমরা দেখছি, মনুষ্য-পোষাক পরিধান করে আজ হিংস্র জন্তুরা আমাদের সম্মুখে বিচরণ করছে। কবির ভাষায় ঃ 'বিশ্বাস করার মত মানুষ এ জগতে কে আছে? সৎ ও মহৎ লোকের জন্য যোগ্য বন্ধু পাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে গেছে। কিছু সংখ্যক মানুষকে বাদ দিলে আর বাকীরা হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়েছে ; যদিও তারা বাহ্যতঃ মনুষ্য-পোষাক পরে মানব সমাজে বিচরণ করে।'

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'শীঘ্রই এমন এক যমানা আসছে, যখন মানুষের মধ্য থেকে 'আমানতে'র গুণটি উঠিয়ে নেওয়া হবে। লোকেরা পরস্পর লেন-দেন ও ক্রিয়া-কর্ম আন্‌জাম দিবে ; কিন্তু 'আমানত' কারও মধ্যে থাকবে না, এবং তা' এতোই দুষ্প্রাপ্য ও কঠিন বস্তু হবে যে, লোকেরা বলাবলি করবে, অমুক গ্রামে অমুক গোত্রে একজন 'আমানতদার লোক' আছে।'

তওবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পবিত্র কুরআনের প্রচুর আয়াত ও অসংখ্য হাদীসের দ্বারা তওবার ফর্‌যিয়ৎ ও অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

'মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তওবা কর, যাতে সফলকাম হতে পারো।' (নূর ঃ ৩১)

উক্ত আয়াতে সাধারণভাবে সকল ঈমানদার ব্যক্তিকে তওবার হুকুম

করা হয়েছে।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

'মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর—আন্তরিক তওবা।' (তাহ্‌রীম ঃ ৮)

'নাছূহ' (نصوح) শব্দের মর্ম হচ্ছে—এমন স্বচ্ছ, নির্মল ও সনিষ্ঠ তওবা, যার মধ্যে শির্‌ক রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতার লেশমাত্র থাকে না।

নিম্নের এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তওবার ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে, তাদেরকে ভালবাসেন।' (বাকারাহ্‌ ঃ ২২২)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ

'তওবাকারী আল্লাহ্‌র বন্ধু, তওবাকারী গুনাহ্‌ থেকে নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় পবিত্র।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'কোন ঈমানদার ব্যক্তি তওবা করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তা'তে কিরূপ আনন্দিত হোন, তা' তোমরা নিম্নের উদাহরণ দ্বারা বুঝতে পারবে। যেমন কোন ব্যক্তি ঘটনাক্রমে একটি জনমানবহীন মরুভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হলো। যেখানে ভয়-ভীতির কোন অন্ত নাই। সেই ব্যক্তির সঙ্গে তার আরোহণের জন্তুটিও ছিল। ব্যক্তিটি ক্লান্তিভরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ইত্যবসরে তার জন্তুটি খাদ্য ও পানীয় সহ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। লোকটি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর জন্তুটিকে না পেয়ে হতাশ হয়ে সেটিকে খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লো। এমতাবস্থায় সে বাহন ব্যতীত বাহিরেও আসতে

পারে না ; আর তথায় পড়ে থাকলে খাদ্য বিহনে তার মৃত্যুবরণ করতে হবে, অধিকন্তু প্রখর-রৌদ্রের প্রাণান্তকর তাপ তো আছেই। লোকটি এই চিন্তা করে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে স্বীয় বাহুতে মাথা রেখে অবধারিত মৃত্যুর অপেক্ষায় নিদ্রিত হয়ে পড়লো। অতঃপর হঠাৎ নিদ্রা হতে উঠে দেখলো, তার আরোহণের উটটি খাদ্যসম্ভার সহ তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। এইরূপে নিরাশার আঁধারে আশার আলো দেখতে পেয়ে তখন ঐ লোকটির যেমন আনন্দের সীমা থাকবে না, তদ্রূপ কোন বান্দা পাপের পথ হতে দ্বীনের পথে ফিরে এসে তওবা করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তদপেক্ষা অধিক আনন্দিত হয়ে থাকেন।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস্‌ সালামের তওবা কবূল করলেন, তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাঁকে মুবারকবাদ দিলো। এই সুবাদে জিব্‌রাঈল ও মীকাঈল আলাইহিমাস্‌ সালামও এসে বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার তওবা কবূল করেছেন ; আপনার মনের আকাংখা পূর্ণ হয়েছে, চক্ষু জুড়িয়েছে।' হযরত আদম (আঃ) বললেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! এখন তওবা কবূলের পর কি জানতে পারি যে, আমার মকাম ও অবস্থান কোন পর্যায়ে?' তখন ওহী আসলো ঃ 'হে আদম! তোমার আওলাদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য আমি দুঃখ-ক্লেশ ও যাতনা-সাধনা অবধারিত করে দিয়েছি, আর তোমার সূত্রে তারা 'তওবা' উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত হবে। তাদের যে-কেউ আমার কাছে তওবা করবে, আমি অবশ্যই তা' কবূল করবো, তাদের গুনাহ্‌ মাফ করে দিবো ; এ ব্যাপারে আমি কোনরূপ কৃপণতা করবো না। কেননা আমার ছিফত হচ্ছে, বান্দার ডাকে সাড়া প্রদানকারী, আমি বান্দার অতি নিকটবর্তী। হে আদম! তওবাকারী ব্যক্তিকে আমি হাশরের ময়দানে এভাবে উত্থিত করবো যে, সে আনন্দভরে হাসতে থাকবে, তার প্রার্থনা আমি কবূল করবো।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالتَّوْبَةِ لِمُسِيْءِ اللَّيْلِ إِلَى النَّهَارِ

وَلِمُسِيْءِ النَّهَارِ اِلَى اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ

'রাত্রিতে যে পাপে লিপ্ত হয়েছে, তার গুণাহ্‌মাফীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হস্ত প্রসারিত করে তাকে সারাদিন ডাকতে থাকেন। আর দিবসের পাপাচারীকে তওবার জন্য সারারাত্র ডাকতে থাকেন। এভাবে মাগরিব থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ডাক অব্যাহত থাকে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'কখনও এমন হয় যে, বান্দা গুনাহ্ করে এবং গুনাহের কারণেই সে জান্নাত লাভের সুযোগ পায়।' জিজ্ঞাসা করা হলো,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি করে সম্ভব?' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'উক্ত গুনাহের কারণে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, সর্বদা তা' থেকে দূরে থাকে—এভাবে কৃত পাপের তওবা তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

كَفَّارَةُ الذَّنْبِ النَّدَامَةُ

'লজ্জা ও অনুতাপ বান্দার গুনাহের ক্ষতিপূরণ করে দেয়।'

বর্ণিত আছে,—'একদা একজন হাবশী লোক হুযূরকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন ইবাদত করি, তখন কি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দেখেন? হুযূর বললেন ঃ 'অবশ্যই দেখেন।' এ কথা শুনে লোকটি সজোরে এক চিৎকার দিল। পরক্ষণেই দেখা গেল তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে।'

শয়তান ইবলীস অভিশপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র কাছে কিছুকাল হায়াত প্রার্থনা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিয়েছেন। তখন সে বলেছিল,—'হে আল্লাহ্! তোমার ইয্‌যতের কসম, বনী আদমের দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণবায়ু থাকে, আমি তাদেরকে তোমার আনুগত্য হতে বিমুখ করে রাখবো।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ 'আমার ইয্‌যত ও পরাক্রমশীলতার কসম, প্রতি মুহূর্তে আমি বনী আদমের জন্য তওবার দরজা খোলা রাখবো।'

হাদীস শরীফে আছে,—'নেক আমল পাপকে এমনভাবে মোচন করে দেয়, যেমন পানি ময়লা-কদর্যকে দূর করে দেয়।'

হযরত সায়ীদ ইব্‌নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ اِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا (আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করেন) এই আয়াতটি এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে পাপকার্য করার পর তওবা করে, আবার পাপে লিপ্ত হয় আবার তওবা করে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র ফরমান রয়েছে যে, পাপী লোকদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের তওবা কবূল হবে, আর পরম পুণ্যবানদেরকে (ছিদ্দীকীন) হুঁশিয়ার করে দাও যে, যদি তাদের হিসাব লওয়া হয়, তা' হলে তারা শাস্তির যোগ্য হবে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি পাপের কথা স্মরণ করে দুঃখিত হয় এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে শঙ্কিত হয়, তার পাপ আমলনামা থেকে মিটিয়ে দেওয়া হয়।'

একদা এক বুযুর্গ থেকে একটি পাপকার্য সংঘটিত হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, পুনরায় যদি এমন হয়, তা' হলে আমি তোমাকে শাস্তি দিবো। তিনি আরজ করলেন,—'আয় পরওয়ারদিগার! আপনি মহাশক্তিমান, অসীম কুদরতের মালিক, আর আমি দুর্বল ক্ষীণকায় আপনার এক মাখ্‌লূক। সুতরাং আপনার ইয্‌যতের কসম, যদি আপনি দয়া করে আমাকে পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা না করুন, তা' হলে আমার নিজ ক্ষমতায় গুনাহ্ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।' এ কাকুতির ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'একজন পাপী লোক তওবা করতে চায়, তার তওবার কোন অবকাশ আছে কি?' একথা শুনে হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) স্বীয় চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তার দিকে তাকিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন ঃ 'জান্নাতের বহু দরজা আছে সেগুলো সময় সময় খোলা হয় এবং বন্ধ করা হয় ; কিন্তু একমাত্র তওবার দরজাটি কখনও বন্ধ করা হয় না ; বরং সর্বদা সেখানে একজন ফেরেশ্‌তা মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। সুতরাং তোমরা নেক আমল ও ইবাদতের ব্যাপারে কখনো নিরাশ হয়ো না।'

বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন যুবক ছিল। দীর্ঘ বিশ বছর সে আল্লাহ্

তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করেছে। পরবর্তী বিশ বছর সে আল্লাহ্‌র না-ফরমানী ও অবাধ্যতার মধ্যে কাটিয়েছে। একদা সে আয়নার ভিতর দৃষ্টি করে দেখে, তার দাঁড়ি পাকতে আরম্ভ করেছে। তখন সে অনুতাপ করে বলেছে,—'হে মাওলা! বিশ বছর আমি তোমার ইবাদত করেছি, তারপর বিশ বছর তোমার না-ফরমানীতে কাটিয়েছি। এখন যদি আমি আবার তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করি, তা' হলে কি তুমি আমার তওবা কবুল করবে? একথা বলার পর গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো,—'তুমি আমাকে মহব্বত করেছো, তখন আমিও তোমাকে মহব্বত করেছি। আবার যখন তুমি আমাকে পরিহার করেছো, আমিও তোমাকে পরিহার করেছি, তুমি আমার অবাধ্যতা করেছো, তখন আমি তোমাকে অবকাশ দিয়েছি এবং তোমার উপর আযাব নাযিল করি নাই। এখন যদি তওবা করে তুমি আমার দিকে ফিরে আসো, তা' হলে আমি তোমার তওবাও কবুল করে নিবো।'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إذا تاب العبد تاب الله عليه وأنسى الحفظة ما كانوا كتبوا من مساوئ عمله وأنسى جوارحه ما عملت من الخطايا وأنسى مكانه من الأرض ومقامه من السماء ليجيء يوم القيامة وليس شيء من الخلق يشهد عليه

'বান্দা যখন তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবূল করেন এবং গুনাহ্ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশ্‌তাদেরকে তার গুনাহ্ ভুলিয়ে দেন। অনুরূপ সেই তওবাকারী ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেগুলোর সাহায্যে সে গুনাহ্ করেছে, যমীনের যে অংশে সে গুনাহ্ করেছে এবং আসমানের নীচে যেখানে সে গুনাহ্ করেছে, এসব কিছুকে আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপের বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত করে দেন, যাতে দুনিয়ার কোন মাখ্‌লূক কিয়ামতের ময়দানে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে না পারে।'

হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'বিশ্ব জগত সৃষ্টি করার চার হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা আরশের নীচে লিখে রেখেছেন,—যে ব্যক্তি তওবা করবে এবং ঈমান আনয়ন করবে, অনুরূপ যে ব্যক্তি নেক আমল করবে এবং সঠিক হেদায়াতের পথে চলবে, তাদেরকে আমি অবশ্যই ক্ষমা করবো।'

স্মরণ রেখো,—ছোট-বড় প্রত্যেকটি গুনাহ্ থেকে তওবা করা ফরযে আইন। কেননা ছোট গুনাহ্ করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে মানুষ বড় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সাহস করে বসে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم

'তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।' (আলি-ইমরান ঃ ১৩৫)

বস্তুতঃ 'তাওবাতুন্নাছূহে'র অর্থ হচ্ছে, মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্তঃকরণ উভয় দিক থেকেই তওবা করবে। পচা-গান্ধা গলিজের উপর সুদর্শন রেশমী কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়ে রাখলে দর্শক প্রথমতঃ বিস্মিত হবে বটে ; কিন্তু উপর থেকে আচ্ছাদনটি সরিয়ে নিলে, পূঁতিগন্ধময় গলিজ বেরিয়ে আসবে, তখন যে-কেউ মুখ ফিরিয়ে নিবে। অনুরূপ, মাখ্‌লুকের দৃষ্টি হয় বাহ্যিক রূপের উপর ; কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বান্দার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করা হবে, তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাদের চেহারা ফিরিয়ে নিবে।

এ জন্যেই হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আমলের বাহ্যিক রূপ দেখেন না ; বরং তিনি তোমাদের অন্তরের অবস্থা দেখেন।"

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—ক্বিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন হবে, যারা নিজেদেরকে তওবাকারী বলে দাবী করবে ; কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে তাদেরকে প্রকৃত তওবাকারী হিসাবে গণ্য করা হবে না। কারণ, তারা তওবার সঠিক তরীকা অবলম্বন করে নাই ; দুনিয়াতে তারা বাহ্যতঃ তওবা করেছে বটে ; কিন্তু কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় নাই, ভবিষ্যতে গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করার দৃঢ়সংকল্প করে নাই, যাদের উপর জুলুম করেছে, তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই, তাদের হক আদায় করে নাই ; অথচ এদের জন্য সে সুযোগ ছিল। অবশ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি হক আদায় করা সম্ভব না হয়, অতঃপর তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে এস্তেগ্‌ফার ও মঙ্গল কামনা করে, তা' হলে আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা পাওনাদারদের রাজী করে তওবাকারীকে পরিত্রাণ দিবেন। এক্ষেত্রে আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, সবচেয়ে বড় আপদ হচ্ছে, গুনাহ্ করে ভুলে যাওয়া এবং এমন গাফেল হওয়া যে, তওবা করার কথা অন্তরে উদয় হয় না। সুতরাং প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে, সর্বদা স্বীয় কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, অকস্মাৎ কোন গুনাহ্ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তওবা করা ; এ ব্যাপারে গাফেল ও বিস্মৃত মোটেও না হওয়া। যেমন জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الْمُذْنِبُ الْمُحْصِى جَرَائِمَهُ
لَا تَنْسَ ذَنْبَكَ وَاذْكُرْ مِنْهُ مَا سَلَفَا

'ওহে পাপী, চরম পর্যায়ে উপনীত অপরাধী! তোমার পাপাচারের কথা ভুলে যেয়ো না ; অতীতের পাপরাশি সব স্মরণ কর।'

وَتُبْ اِلَى اللّٰهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَانْزَجِرَا
يَا عَاصِيًا وَاعْتَرِفْ اِنْ كُنْتَ مُعْتَرِفًا

'এবং মৃত্যুর পূর্বেই সতর্ক হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে স্বীয় গুনাহ্ স্বীকার করে অনুতপ্ত হও এবং সত্যিকারের তওবা কর।'

ফকীহ্ আবুল-লাইস (রহঃ) সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত উমর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার দ্বার-প্রান্তে একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার অন্তর জ্বালিয়ে দিয়েছে। হুযূর বললেন,—তাকে ভিতরে আসতে দাও। অতঃপর যুবক কাঁদতে কাঁদতে ভিতরে প্রবেশ করলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে আরজ করলো ঃ 'হুযূর! আমি মারাত্মক গুনাহ্ করে ফেলেছি ; তাই মহান আল্লাহ্‌র ভয়ে আমি রোদন করছি।' হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তুমি কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্‌ক করেছো? কাউকে না-হক কতল করেছ?' সে বললো ঃ 'না'। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তা'হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন, চাই সে গুনাহ্ সাত আসমান-যমীন ও পাহাড়ের সমপরিমাণই হোক না কেন।' যুবক আরজ করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার গুনাহ্ এর চাইতেও বড় এবং অধিক মারাত্মক।' হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তা' হলে কি তোমার গুনাহ্ আল্লাহ্‌র কুরসীর চাইতেও বড়?' যুবক বললো ঃ 'আমার গুনাহ্ খুবই মারাত্মক।' হুযূর বললেন ঃ 'তোমার গুনাহ্ কি আল্লাহ্‌র আরশের চাইতেও বড়?' যুবক বললো ঃ আমার গুনাহ্ খুবই মারাত্মক। আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ তোমার গুনাহ্ কি স্বয়ং আল্লাহ্‌র চাইতেও বড়? অর্থাৎ,— আল্লাহ্‌র ক্ষমা সবচাইতে বেশী। যুবক বললো ঃ হুযূর! আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান। হুযূর বললেন ঃ 'তা' হলে শুনো, মহান আল্লাহ্ বড় বড় গুনাহ্ মাফ করে দেন।'

অতঃপর হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি গুনাহ্ করেছো? আমাকে বলো। সে বললো,—হুযূর! তা' ব্যক্ত করতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়। হুযূর পুনরায় তাকে বলতে নির্দেশ করলেন। সে বললো,—'আমি বিগত সাত বছর যাবৎ কাফন চুরি করে আসছি। কিছুদিন হয় এক আনসারী যুবতীর মৃত্যু হয়। তাকে দাফন করার পর কবর খুঁড়ে আমি তার কাফন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় শয়তান আমার মনে কুমন্ত্রণা দিলো। ফলে, আমি যুবতীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি। অতঃপর আমি কিছুদূর যেতে না যেতেই যুবতী হঠাৎ কবর থেকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো,—'ওহে

যুবক! তোর ধ্বংস হোক, মহাবিচারকের (আল্লাহ্‌র) প্রতি কি তোর কোন ভয় নাই, তিনি মজলূমের পক্ষ হয়ে জালেমের প্রতিশোধ নিবেন ; তুই আমাকে অগণিত মৃতের সম্মুখে লজ্জিত করলি এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে আমাকে না–পাক অবস্থায় দাঁড় করালি।' একথা শুনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীঘ্র তার গর্দান ধরে বের করে দিলেন এবং বললেন ঃ 'হে ফাসেক! তুই তো জাহান্নামের উপযুক্ত কাজ করেছিস।' অতঃপর যুবক আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করতে করতে বের হয়ে গেলো। দীর্ঘ চল্লিশ রাত্র সে একাধারে আল্লাহ্‌র কাছে অনুতাপ ও কান্নাকাটি করার পর আসমানের দিকে মাথা উঠিয়ে বললো,—'ওগো খোদা! মুহাম্মদ, আদম ও ইব্‌রাহীমের খোদা! যদি তুমি আমাকে মা'ফ করে দিয়ে থাকো, তা' হলে এ খবর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে জানিয়ে দাও। আর যদি আমাকে মা'ফ না করে থাকো, তা' হলে আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণ করে আমকে জ্বালিয়ে দাও এবং আখেরাতে তোমার আযাব থেকে রক্ষা কর।' অতঃপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে জিব্‌রাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার রব্ব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, দুনিয়ার সমস্ত মাখ্‌লূক কি আপনি সৃষ্টি করেছেন না আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন?' হুযূর বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এবং সমস্ত জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সকলের রিযিকদাতা।' হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, তিনি সেই যুবককে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবককে ডেকে উক্ত সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে জনৈক ব্যক্তির অবস্থা এই ছিল যে, সে তওবার উপর অটল থাকতে পারতো না। যখনই তওবা করতো, পরক্ষণেই সে তার বিপরীত কার্যে লিপ্ত হয়ে যেতো। বিশ বছর পর্যন্ত তার এই অবস্থা বলবৎ ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠালেন ঃ 'হে মূসা! আমার এই বান্দাকে বলে দাও যে, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত।' মূসা (আঃ) তাকে এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দিলেন। সে খুবই চিন্তিত ও বিষন্ন হয়ে বিজন প্রান্তরে চলে গেলো

এবং সেখানে সে বলতে লাগলো ঃ 'ওগো খোদা! তোমার অনন্ত রহমত কি শেষ হয়ে গেছে, না আমার না–ফরমানী তোমার কোন ক্ষতি করতে পেরেছে? তোমার অফুরন্ত ক্ষমার ভাণ্ডার কি শূন্য হয়ে গেছে, না তুমি বান্দার প্রতি ক্ষমার বিষয়ে কৃপণতা করছো? বান্দার কোন্ পাপটি এমন আছে যা' তোমার অনন্ত–অনাদি ক্ষমা ও দয়া–গুণের চাইতে বড়। অন্যায়–অপরাধ করা তো বান্দার সহজাত স্বভাব, এ স্বভাব কি তোমার অনন্ত মহিমাকে অতিক্রম করতে পারে? না ; তা' কিছুতেই সম্ভব নয়। তুমি যদি তোমার বান্দার প্রতি রহমত ও দয়াবর্ষণ বন্ধ করে দাও, তা' হলে সে কার কাছে আশা করবে? আর তুমি যদি তাকে বিমুখ করে দাও, তা' হলে সে কার দ্বারে ধন্না দিবে? যদি আমি দুর্ভাগার প্রতি তোমার রহমত ও দয়ার দরজা বন্ধ হয়ে থাকে, আর শাস্তি যদি আমার জন্য অবধারিত থাকে, তা' হলে তোমার সকল বান্দার আযাব একা আমাকে দাও, আমি সকলের পক্ষ থেকে এই আযাব গ্রহণ করে নিবো।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! তুমি আমার সেই বান্দার কাছে গিয়ে বল,—তুমি যদি সমগ্র পৃথিবী ভরে গুনা'ও করে থাকো, তবু আমি তা' ক্ষমা করে দিলাম। কেননা, তুমি আমার কুদরত ও দয়ার ছিফাতকে উপলব্ধি করেছো।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا مِنْ صَوْتٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ صَوْتِ عَبْدٍ مُذْنِبٍ تَائِبٍ يَقُوْلُ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ الرَّبُّ لَبَّيْكَ يَا عَبْدِىْ سَلْ مَا تُرِيْدُ اَنْتَ عِنْدِىْ كَبَعْضِ مَلَائِكَتِىْ اَنَا عَنْ يَّمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَفَوْقَكَ وَقَرِيْبٌ مِّنْ ضَمِيْرِ قَلْبِكَ اَشْهَدُوْا يَا مَلَائِكَتِىْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهٗ

'আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক পছন্দীয় আওয়ায হচ্ছে, গুনাহের পর তওবাকারী বান্দার আওয়ায, যে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলে—'ইয়া রব্ব!' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'ওহে বান্দা! আমি তোমার সম্মুখেই আছি,

তোমরা যা ইচ্ছা, আমার কাছে চাও, তোমার মর্যাদা আমার কাছে কোন কোন ফেরেশ্‌তার সমতুল্য, আমি তোমার ডান, বাম, উপর সর্বদিকে বিরাজমান এবং তোমার অন্তরের অতি নিকটবর্তী। হে আমার ফেরেশ্‌তারা! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে মা'ফ করে দিলাম।'

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন,—আল্লাহ্ তা'আলার বহু বান্দা এমন আছে, যারা জীবনে প্রথমতঃ পাপের বৃক্ষ রোপন করেছে ; অর্থাৎ,—জীবনে বহু গুনাহ্ করেছে। পরবর্তীতে অতীত কৃতকর্মের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পাপবৃক্ষে প্রচুর পরিমাণে তওবার পানি সিঞ্চন করেছে। অতঃপর সেই বৃক্ষে স্বীয় অতীত জীবনের উপর দুঃখ ও আক্ষেপের ফল দেখা দিয়েছে। এখন উন্মাদনা ব্যতিরেকেই তারা আল্লাহ্‌র পাগল। বড় জ্ঞানী ও বিবেকবান হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা তাদেরকে নির্বোধ জ্ঞান করে। অথচ তারা আল্লাহ্‌র আরেফীন ও যথার্থ পরিচয়প্রাপ্ত। তারা অন্তরের স্বচ্ছতা ও নিস্কলুষতার জন্য কৃচ্ছ্র-সাধনার অমৃত পান করেছে। সীমাহীন কষ্ট ও দুঃখ-যাতনা বরদাশ্‌ত করেছে। ফলে, তাদের অন্তর আসমানী পরিবেশে 'স্বচ্ছ' স্বীকৃত হয়েছে। তাদের ধ্যান ও ভাবনা আল্লাহ্‌র মহামহিয়ান দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। তারা লজ্জা ও অনুতাপের পত্র-পল্লবিত ছায়ায় বিচরণ করে। তারা স্বীয় আমল-নামাতে নিজেদের গুনাহ্ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর অনুতপ্ত ও বিনয়াবনত অন্তরে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেন। অতঃপর তারা 'তাকওয়া' ও খোদাভীতির সিঁড়িতে আরোহণপূর্বক বুযুর্গীর উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। পার্থিব স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার তিক্ততা তাদের নিকট মিষ্ট অনুভূত হয়। শক্ত বিছানা তাদের গাত্রে নরম ও মোলায়েম বোধ হয়। চরম-সাধনার ফলশ্রুতিতে তারা মুক্তি ও পরিত্রাণের রশি ধারণ করতে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাদের রূহ্ অতি উচ্চতায় ভ্রমন করে এবং নায-নে'আমতের সুশোভিত বাগিচায় বিচরণ করে। এভাবে তারা চরম ও পরম ইয্‌যতের মর্যাদায় চিরদিনের জন্য অধিষ্ঠিত হয়।

অধ্যায় ঃ ১৮

স্নেহ-মমতা ও দয়ার্দ্রচিত্ততা

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'জান্নাতে কেবল দয়ার্দ্রচিত্ত লোকেরাই প্রবেশ লাভ করবে।' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সকলেই তো দয়ার্দ্রচিত্ত।' হুযুর বললেন,—'কেবল নিজের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শনই যথেষ্ট নয় ; বরং প্রকৃত দয়া হচ্ছে, নিজের প্রতি এবং সেই সঙ্গে অপরের প্রতিও দয়ার্দ্রচিত্ত ও সহানুভূতিশীল হতে হবে।'

নিজের প্রতি দয়া ও রহম প্রদর্শনের অর্থ হচ্ছে,—সমস্ত পাপকার্য পরিহার করে খালেছ তওবা করতঃ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে আখেরাতের আযাব হতে আত্মরক্ষা করা। আর অপরের উপর রহম করার অর্থ হচ্ছে, কোন মুসলমানকে কষ্ট না দেওয়া। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ -

'প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে, যার কথায় ও কাজে অপর কোন মুসলমান কষ্ট না পায় ; বরং তার দ্বারা সকলেই শান্তি পায়।'

শুধু মুসলমানই নয়, গোটা মানব বরং জীব-জন্তুর প্রতিও রহম করতে হবে। হাদীস শরীফে আছে,—কোন পথিক কঠিন পিপাসায় পতিত হয়। একস্থানে একটি কুঁয়া দৃষ্টিগোচর হলে, তাতে নেমে সে পানি পান করে উপরে উঠার পর দেখে, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং পিপাসার আতিশয্যে জিহ্বা বের করে রেখেছে। পথিক ভাবলো, পিপাসায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল, এটিরও তো অনুরূপ অবস্থা হয়েছে। একথা ভেবে সে নিজের পা থেকে চামড়ার মোজা খুলে তাতে পানি ভরে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ্ তা'আলা পথিকের এই কাজটিকে পছন্দ করলেন এবং তাকে মা'ফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ইয়া

রাসূলাল্লাহ্! তা' হলে কি জীব-জানোয়ারের প্রতিও রহম করলে তাতে আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে?' আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'অবশ্যই, প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলা সওয়াব রেখেছেন।'

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ 'একদা আমীরুল-মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) লোকজনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য গভীর রাত্রিতে একাকী ঘুরা-ফেরা করছিলেন। পথে এক জায়গায় মুসাফিরদের একটি কাফেলার নিকটবর্তী হলেন। তাঁর আশংকা হলো, রাত্রিতে তাদের মাল-সামান চুরি না হয়ে যায়। এমন সময় হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বললেন ঃ 'আমীরুল-মুমিনীন! এতো রাত্রিতে আপনি এখানে?' হযরত উমর বললেন ঃ 'আমি এই কাফেলার পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, আশংকা হলো, রাত্রিতে এরা ঘুমিয়ে যাবে, এই সুযোগে তাদের মাল-সামান চুরি হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে, তাই চল, আমরা তাদের মাল-সামান পাহারা দেই।' অতঃপর কাফেলার নিকটবর্তী একটি স্থানে বসে উভয়েই তাদের মাল-সামান হেফাযতের জন্য সারারাত্রি পাহারা দিলেন। ফজরের সময় হযরত উমর আওয়ায দিলেন,—'ওহে কাফেলার লোকজন! নামাযের সময় হয়ে গেছে, তোমরা উঠ।' যখন দেখলেন, তারা জাগ্রত হচ্ছে, তখন তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।'

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কেরামের জীবনে রয়েছে আমাদের জন্য অসংখ্য অগণিত আদর্শ। সুতরাং আমাদের উচিত, তাঁদের অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁদের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

'(তাঁরা) নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।' (ফাত্‌হ ঃ ২৯)

তাঁদের জীবনালেখ্যে লক্ষ্য করা যায়, শুধু মুসলমানই নয়, প্রতিটি সৃষ্ট-জীবের প্রতি তাঁরা ছিলেন দয়ার্দ্রচিত্ত, স্নেহ-মমতাশীল। এমনকি বিধর্মী প্রজাদের প্রতিও তাঁরা দয়া প্রদর্শন করেছেন।

একদা আমীরুল-মুমিনীন হযরত উমর (রাযিঃ) একজন বিধর্মী প্রজাকে দেখলেন, দ্বারে দ্বারে সে ভিক্ষা করছে। লোকটি ছিল বৃদ্ধ। হযরত উমর

তাকে বললেন ঃ 'আমি তোমার প্রতি ইনসাফ ও ন্যায় ব্যবহারে ত্রুটি করছি ; যখন তুমি যুবক ছিলে, তখন তোমার নিকট থেকে কর (ট্যাক্স) ওসূল করেছি, আর এখন তোমার প্রতি আমি লক্ষ্য নিচ্ছি না। একথা বলে হযরত উমর (রাযিঃ) তার জন্য বায়তুল-মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ 'একদা আমি হযরত উমর (রাযিঃ)-কে দেখি, উটের পিঠে আরোহণ করে সকাল সকাল 'আব্‌তাহ্' অঞ্চলে ঘুরাফেরা করছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ 'বায়তুল-মালের একটি উট হারিয়ে গেছে, তা' তালাশ করছি।' আমি বললাম, 'হে আমীরুল-মুমিনীন! আপনি এভাবে কষ্ট করে পরবর্তী খলীফাদের দায়িত্ব কঠিনতর করে দিয়ে যাচ্ছেন।' হযরত উমর বললেন ঃ 'হে আবুল হাসান (হযরত আলীর উপনাম)! মুহাম্মদকে নুবুওয়াত প্রদানকারী খোদার কসম, সাধারণ একটি বকরীর বাচ্চাও যদি ফুরাত নদীর তীরে চলে যায়, আর আমি সেটার হেফাযত না করি, তা'হলে ক্বিয়ামতের দিন এজন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।' অতএব প্রণিধানযোগ্য যে, মুসলমান প্রজাসাধারণের হেফাযত করে না যেসব শাসক, যারা প্রজাদের নিরাপত্তা বিধানে গাফেল, তাদের কোনই মূল্য নাই, কিছুতেই স্বীকৃতি দেওয়া যায় না তাদেরকে।

হযরত হাসান (রাযিঃ) রেওয়ায়েত করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমার উম্মতের আব্‌দাল বুযুর্গগণ নামায-রোযার আধিক্যের কারণে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না ; বরং তাঁরা বেহেশ্‌তে এজন্যে যাবে যে, তাঁদের অন্তর হবে নিষ্কলুষ ও হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত এবং তাঁদের হৃদয় হবে উদার, সকলের প্রতি তারা হবে দয়ার্দ্রচিত্ত ও সহানুভূতিশীল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ

'মহৎ ও দয়াশীল লোকদের প্রতি অনন্ত দয়াবান (আল্লাহ্) অনুগ্রহ করেন।

সুতরাং দুনিয়ার মাখ্‌লুকের প্রতি তোমরা দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, তা'হলে ঊর্ধ্বজগতের সকলেই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া করে না, সে অন্য কারও দয়া পায় না। অনুরূপ যে অপরকে ক্ষমা করে না, সে কারও ক্ষমা পায় না।'

হযরত মালেক ইব্‌নে আনাস (রাযিঃ) বলেন,—রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'মুসলমানদের হক চারটি। এক, সৎ ও পুণ্যবান লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। দুই, পাপী ও অপরাধী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তিন, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করা। চার, পাপ থেকে তওবাকারী ব্যক্তিকে ভালবাসা।'

একদা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আরজ করেছেন ঃ 'ইয়া রব্ব! আপনি আমাকে কোন্ বিষয়টির কারণে বিশিষ্ট বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন?' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'আমার সৃষ্টির প্রতি তোমার দয়া ও অনুগ্রহের কারণে।'

হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—তিনি শিশু-বাচ্চাদের পিছনে পিছনে যেতেন এবং তাদের কাছ থেকে ধৃত বন্দী পাখী খরিদ করে মুক্ত করে আকাশে ছেড়ে দিয়ে বলতেন, 'হে পাখী! যাও দীর্ঘদিন বেঁচে থাক।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'মুসলমানদের পারস্পরিক সহানুভূতি, সৌহার্দ্য ও ভালবাসার উদাহরণ হচ্ছে একটি দেহ। দেহের যে-কোন একটি অঙ্গ পীড়িত হলে গোটা দেহটি পীড়িত হয়, জরাগ্রস্ত হয় এবং বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে। অনুরূপ যে কোন একজন মুসলমানের দুঃখ-যাতনায় সকল মুসলমান জর্জরিত হবে।'

বনী ইসরাঈল গোত্রের একজন আবেদ লোক একটি জনপদ দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় সেখানকার লোকজনকে দুর্ভিক্ষের কারণে কঠিন জঠর-জ্বালায় অস্থির দেখে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে মনে মনে আরজু-আকাংখা করেছিলেন,—'হায়! আজকে যদি আমার কাছে এদের ক্ষুধা নিবারণের পরিমাণ আটা থাকতো, তা'হলে আমি তৎসমুদয় এদেরকে দান করতাম, তারা তৃপ্ত হয়ে খেতো।' আল্লাহ্ তা'আলা তৎকালীন নবীর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ

'তুমি তাকে জানিয়ে দাও, তার শুধু উক্ত আকাংখার কারণে আমি সেই পরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি।' হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ -

'মুমিনের নিয়ত তার আমলের চাইতে উত্তম।'

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সাথে পথিমধ্যে ইবলীসের সাক্ষাৎ হয়। তার এক হাতে ছিল মধু অপর হাতে ছিল ভস্ম। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইবলীস বললো,—মধু আমি তাদেরকে পান করাই, যারা গীবত ও পরনিন্দা করে, আর ভস্ম আমি এতীমের মুখে মেখে থাকি, যাতে লোকজন তার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে অনুকম্পা প্রদর্শন না করে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'এতীমের প্রতি যখন জুলুম করা হয়, তখন আল্লাহ্‌র আরশ তার কান্নার কারণে কাঁপতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,—'হে আমার ফেরেশ্‌তারা ! দেখ, এই এতীমকে কে কাঁদাচ্ছে, যার পিতাকে আমি দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েছি।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اٰوٰى يَتِيْمًا اِلٰى طَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি এতীমের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিবে, প্রতিদানে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দিবেন।'

'রওজাতুল-উলামা' কিতাবে আছে,—'হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ করার পূর্বে এক দুই মাইল পর্যন্ত লোক তালাশ করতেন, যাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি খানা খাবেন।'

একদা হযরত আলী (রাযিঃ) কাঁদতে ছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ 'আজকে এক সপ্তাহ যাবৎ আমার বাড়ীতে কোন মেহমান আসে না। জানিনা, আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা।'

হাদীস শরীফে আছে,—'যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্তকে অন্নদান করবে, জান্নাত

তার জন্য অবধারিত। আর যদি কেউ ক্ষুধার্তের সম্মুখ থেকে খাদ্যবস্তু সরিয়ে নেয়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে আপন করুণা সরিয়ে রাখবেন এবং তাকে দোযখের শাস্তি দিবেন।'

হাদীস শরীফে আরও আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ ـ

'মহৎ ও দানশীল লোক আল্লাহ্র অতি নিকটবর্তী, তারা জান্নাতেরও অতি নিকটে, সাধারণ লোকজনও তাদের ভালবাসে এবং দোযখ থেকে তারা বহু দূরে। পক্ষান্তরে, কৃপণ ও সংকীর্ণ-হৃদয় লোক আল্লাহ্ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, সর্বসাধারণও তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ ; কিন্তু তারা দোযখের অতি নিকটবর্তী।'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

اَلْجَاهِلُ السَّخِيُّ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيْلِ ـ

'স্বল্প ইবাদতকারী দয়ালু ও মহৎ ব্যক্তি অধিক ইবাদতকারী কৃপণ ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ।'

হাদীস শরীফে আছে,—'চার প্রকারের লোক ক্বিয়ামতের দিন বিনা হিসাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে ঃ এক, যে আলেম স্বীয় ইল্ম অনুযায়ী আমল করে। দুই, যে ব্যক্তি সর্ববিধ অশোভন কাজ ও ঝগড়া-বিবাদ হতে মুক্ত-পবিত্র থেকে হজ্জকার্য সমাধা করে। তিন, যে ব্যক্তি ইসলামের কালেমা বুলন্দ করার উদ্দেশে জিহাদ করে শহীদ হবে। চার, যে দয়ালু ও মহৎ ব্যক্তি হালাল উপার্জন করে এবং একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দ্বীনের পথে অর্থব্যয় করে। এসব লোক সমভাবে (বিনা হিসাবে) জান্নাতে

প্রবেশ করবে, কেউ কারও আগে যাওয়ার জন্য বিবাদ করবে না।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বহু বান্দাকে বিশেষভাবে প্রচুর নে'আমত দান করেছেন, উদ্দেশ্য হলো, এসব নে'আমতের দ্বারা অন্যান্য বান্দা, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বঞ্চিত রেখেছেন, তারা উপকৃত হবে। সুতরাং এসব নে'আমতের ব্যাপারে যারা কৃপণতা প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে সেই নে'আমত অপসারণ করে অন্যের কাছে হস্তান্তর করে দিবেন।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'বস্তুতঃ দয়া ও মহত্ত্ব বেহেশ্তের একটি বৃক্ষ, যার শাখা-প্রশাখা সর্বদা পৃথিবীর দিকে নত হয়ে রয়েছে। এসবের যে কোন একটিকে যে ব্যক্তি অবলম্বন করবে, সে বেহেশ্তের পথে অগ্রসর হবে।'

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন,—এক ব্যক্তি আরজ করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি?' আল্লাহ্র রাসূল বললেন ঃ 'ধৈর্য ও দয়া।'

হযরত মিক্বদাম ইব্নে শুরাইহ্ পিতার সূত্রে পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার আল্লাহ্র রাসূলকে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কিছু আমল বলে দিন, যদ্দারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।' আল্লাহ্র রাসূল ইরশাদ করলেন ঃ

اِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلُ الطَّعَامِ وَاِفْشَاءُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ

'মাগফিরাত তোমার জন্য অবশ্যম্ভাবী, যদি তুমি মানুষকে খাওয়া-দাওয়া করাও, সমাজে সালামের প্রচলন ঘটাও এবং লোকজনের সাথে মিষ্ট ভাষায় কথা বল।'

অধ্যায় ঃ ১৯

নামাযে খুশু-খুজূ বা হুযূরে ক্বাল্‌ব

বর্ণিত আছে, হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্‌ সালাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আসমানে একজন অতি সম্মানিত ফেরেশ্‌তা দেখেছি, যিনি একটি পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট, চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা তাকে ঘিরে বসে আছে ; সকলেই তার খেদমতে নিয়োজিত। এ ফেরেশ্‌তার প্রতিটি নিঃশ্বাস থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এক একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেন। কিন্তু সেই সম্মানিত ফেরেশ্‌তা বর্তমানে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় 'কাফ পর্বতে' বসে বসে কাঁদছেন এবং তার সুন্দর ডানাগুলো ভেঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। আমাকে দেখে তিনি বললেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! তুমি কি আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবে?' আমি তার এ করুণ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন,—'হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাত্রিতে আমার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন; তখন আমি তার অভিবাদনে না দাঁড়িয়ে পালঙ্কের উপরেই বসা ছিলাম। আমার এই অবহেলার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এ শাস্তি দিয়েছেন।' হযরত জিব্‌রাঈল বলেন ঃ 'অতঃপর আমি তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করে সুপারিশ করলাম।' তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! আমি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি সে আমার প্রিয় হাবীবের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে।' অতঃপর সেই ফেরেশ্‌তা দরূদ শরীফের বদওলতে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছেন।'

হাদীস শরীফে আছে,—'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হবে। নামায যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তা' হলে অপরাপর আমলও গ্রহণযোগ্য হবে। নতুবা তার নামাযের সঙ্গে অন্যান্য সকল আমলও প্রত্যাখ্যান করা হবে।' হাদীসে আরও আছে,—'বস্তুতঃ ফরয নামায হচ্ছে অন্যান্য সকল

আমলের জন্য মাপকাঠি স্বরূপ ; যার ফরয নামায পরিপূর্ণ থাকবে, তার অবশিষ্ট আমলও পরিপূর্ণ প্রতীয়মান হবে।' হযরত বুরাইদ রাক্বাশী (রহঃ) বলেন,—'বস্তুতঃ হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের নামায ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত, সুন্দর ও আদর্শ।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'দুই ব্যক্তি একই সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছে, উভয়ের রুকূ'-সিজদা দৃশ্যতঃ একই ; কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যমীন ও আসমানের প্রভেদ থাকে।' বস্তুতঃ এ প্রভেদ নামাযে খুশু-খুজূ ও হুযূরে ক্বাল্‌বের পার্থক্যের কারণেই হয়ে থাকে।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা ওইসব লোকের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি করবেন না, যারা নামাযের রুকূ'-সিজদায় কোমর সোজা করে না।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি নিয়মিত উযূ করে পরিপূর্ণ রুকূ'-সিজদা ও খুশু-খুজূ সহকারে সঠিক সময়ে নামায আদায় করে, তার নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয়। কবূলিয়তের জন্য যখন ঊর্ধ্ব আকাশে আরোহণ করতে থাকে, তখন তা' উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেখায় এবং বলতে থাকে,—'হে নামাযী! তুমি আমাকে যেমন হেফাযত করেছো, আল্লাহ্‌ পাকও তোমাকে হেফাযত করুন।' পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অপূর্ণ উযূ, অপূর্ণ রুকূ'-সিজদা সহকারে অন্যমনস্ক অবস্থায় সঠিক সময়ের বাইরে নামায পড়ে, তার নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয় না ; বরং তা' ঊর্ধ্বারোহণের সময় বিশ্রী কালো বর্ণ ধারণ করে এবং বলতে থাকে,—'খোদা তোমাকে ধ্বংস করুন, যেভাবে আমাকে তুমি ধ্বংস করেছো।' অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী এক জায়গায় পৌছলে সেই নামাযকে ছেঁড়া কাপড়ের মত গুজা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়।'

হাদীস শরীফে আরও আছে, রাসূলাল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,—'নিকৃষ্টতম চোর হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে নামাযে চুরি করে।'

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন,—'বস্তুতঃ নামায হচ্ছে নিক্তি স্বরূপ ; যে ব্যক্তি পুরাপুরি পরিমাপ করবে সেই পুরাপুরি পাবে আর যে

ব্যক্তি মাপে ত্রুটি করবে, তার সতর্ক হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ○

'যারা মাপে কম করে তাদের জন্য দুর্ভোগ।' (তাৎফীফ ঃ ১)

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ 'নামাযের উদাহরণ হচ্ছে,—ব্যবসায়ী ব্যক্তির ন্যায় ; তাকে লাভবান হতে হলে যেমন, তার মূল পুঁজি সঠিক ও নিখুঁত হতে হয়, তেমনি আল্লাহ্র দরবারে নফল ও অতিরিক্ত ইবাদত কবুল হতে হলে ফরয নামায ও অন্যান্য ফরয ইবাদত নিখুঁত ও সঠিক হতে হয়।'

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) নামাযের সময় বলতেন,—চল, নামাযের দিকে চল ; স্বীয় পাপের দ্বারা তুমি যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছো, নামাযের সাহায্যে তা' নির্বাপিত কর।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে,—

اِنَّمَا الصَّلٰوةُ تَمَسْكُنٌ وَّتَوَاضُعٌ

'বস্তুতঃ নামায হচ্ছে বিনয় ও আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক।'

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'নামায যাকে অশুভ ও গর্হিত কাজ হতে বিরত না রাখে, তার নামায তাকে খোদা তা'আলা হতে আরও দূরে সরিয়ে নেয়।'

তিনি বলেন,—'অবহেলিত নামায কখনো অশুভ ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখতে পারে না।'

আরও ইরশাদ হয়েছে,—

كَمْ مِّنْ قَائِمٍ وَّلَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ اِلَّا التَّعَبُ وَالنَّصَبُ

'অনেক নামাযী লোক রয়েছে, যারা শুধু নামাযের পরিশ্রমই করে থাকে, হাকীকত বলতে তাদের কিছুই হাসিল হয় না।' অর্থাৎ,—গাফেল নামাযীদের অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'বান্দা

নামাযের যতটুকু অংশ নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও উপলব্ধি সহকারে আদায় করে, ততটুকু অংশেরই সে সওয়াবপ্রাপ্ত হবে ; অতিরিক্ত নয়।'

আল্লাহ্র যথার্থ পরিচয়-প্রাপ্ত আরিফগণ বলেছেন ঃ চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে নামায পরিপূর্ণ হয়। এক, যথার্থ উপলব্ধি ও মনোযোগ সহকারে নামায আরম্ভ করা। দুই, লজ্জা ও অনুতাপ সহকারে দাঁড়ান। তিন, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নামায আদায় করা। চার,ভয় ও আশংকা সহকারে নামায সমাপ্ত করা।' এক বুযুর্গ বলেছেন,—'যে নামাযে আল্লাহ্র সম্মুখে নিজের বিনয় ও বন্দেগীর বিকাশ না হয়, মূলতঃ সেই নামায দুরস্ত হয় না।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'বেহেশ্তে 'আল-আফ্যাহ্ (প্রশস্ত)' নামক একটি ঝর্ণা আছে। আল্লাহ্ তা'আলা সেই ঝর্ণার ধারে বেহেশ্তবাসীদের উপভোগের জন্য যাফরান দ্বারা অসংখ্য 'যাফরানী হূর' সৃষ্টি করে রেখেছেন। এরা মুক্তার দানা ও পদ্মরাগ মনির দ্বারা খেলা-ধূলা করে এবং সত্তর হাজার ভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার গুণ-কীর্তন করে। তাদের কণ্ঠস্বর হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বরের চাইতেও বেশী আকর্ষণীয় ও মুগ্ধকর। তারা বলে,—'আমরা ওইসব লোকের জন্য যারা খুশু-খুজু ও হুযূরে ক্বল্বের সাথে নামায আদায় করে।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,—অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাত দান করবো এবং আমার দীদার নসীব করবো।'

বর্ণিত আছে,—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠিয়েছিলেন,—'হে মূসা ! তুমি যখন আমাকে স্মরণ করো এবং আমার যিক্রে মগ্ন হও, তখন তোমার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন অকেজো ও অবসাদ-গ্রস্ত হয়ে যায় আর অন্তর যেন নিষ্ঠা, একগ্রতা ও হুযূরে ক্বাল্বের দ্বারা আবাদ হয়ে যায়। অনুরূপ যখন তুমি আমার যিক্রে মগ্ন হও, তখন তোমার জিহ্বাকে অন্তরের পশ্চাতে রাখ, আমার সম্মুখে যখন দণ্ডায়মান হও, তখন নেহায়েত বিনয়ের সাথে দাসানুদাসের ন্যায় থাক। ভীত-শঙ্কিত অন্তঃকরণ এবং মিথ্যার কলুষ হতে মুক্ত জিহ্বার দ্বারা মোনাজাত কর।'

রেওয়ায়াতে আছে,—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট (আরও) ওহী পাঠিয়েছেন,—'হে মূসা ! তোমার উম্মতের অবাধ্যদের বলে দাও, তারা যেন আমাকে স্মরণ না করে। কেননা, আমি আমার নিজের,

সত্তার কসম করেছি যে, আমাকে যে স্মরণ করবে আমি তাকে স্মরণ করবো ; কিন্তু অবাধ্য ও না-ফরমান লোকেরা যদি তওবা না করে আমাকে স্মরণ করে বা যিক্‌রে মগ্ন হয়, তা' হলে আমি তাদেরকে লা'নত ও অভিশাপের সাথে স্মরণ করবো।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, উপরোক্ত অভিশাপের সম্পর্ক ওইসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ্‌র না-ফরমান বটে ; কিন্তু তাঁর স্মরণ হতে গাফেল নয়। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র হতে গাফলতি ও অবাধ্যতা উভয়টা একত্রিত হলে, অবস্থা আরও কত মারাত্মক রূপ ধারণ করবে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই এ কথা বলেছেন যে, 'দুনিয়াতে যে ব্যক্তির নামায যেরূপ হবে ; খুশু-খুজু, হুযূরে ক্বাল্‌ব ও স্বাদ-আস্বাদের দৃষ্টিতে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সেই অনুপাতে আরাম-আয়াশে হাশরের ময়দানে উঠাবেন।'

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন যে, এক ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় দাড়ি সঞ্চালন করছে। তখন তিনি বলেছেন যে, এই ব্যক্তির অন্তরে যদি খুশু-খুজূ ও হুযূরে ক্বাল্‌ব থাকতো, তা' হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও শান্ত থাকতো। বস্তুতঃ যে নামাযে খুশু-খুজূ থাকে না, সেই নামায আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন না।' এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে নামাযে একাগ্রতা ও হুযূরে ক্বাল্‌বের প্রশংসা করেছেন।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ 'নামাযী লোকের অভাব নাই ; কিন্তু মনোযোগ ও হুযূরে ক্বাল্‌ব সহকারে নামায পাঠকারী খুবই কম। হজ্জ্ব পালনকারী বহু আছে ; কিন্তু হজ্জ্বে মাব্‌রূর ক'জন করেছে ; দুনিয়াতে বহু রকমের পাখী আছে ; কিন্তু বুলবুল পাখী খুবই বিরল।'

বস্তুতঃ বিনয় ও একাগ্রতা প্রকাশের জন্য নামাযের চেয়ে উত্তম বস্তু আর নাই। এই বিনয় ও একগ্রতার দ্বারা নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবূলিয়তের মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। নতুবা যে নামাযে একাগ্রতা ও হুযূরে ক্বাল্‌ব নাই, তা' হয় কেবল দায়সারা নামায ; ফরযিয়তের দায়িত্ব চুকানোর জন্য তা' হয়ে থাকে। এরূপ নামায়ের দ্বারা কবূলিয়তের মর্যাদা লাভ হয় না।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا فِيْهِمَا عَلَى اللهِ بِقَلْبِهٖ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে পুরাপুরি রুজু হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ ও একাগ্রতা সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করবে, সে পাপ থেকে এমন মুক্ত ও পবিত্র হবে, যেমন সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু।'

এ কথা স্মরণ রেখো যে, নামাযের ভিতর আজে-বাজে খেয়াল ও অহেতুক বিষয়ের চিন্তা আসলে নামাযের মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং গাফলতি ও অন্যমনস্কতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এসব খেয়াল ও চিন্তাকে দূর করার নিয়ম হলো,—শোরগোল থেকে দূরে কিছুটা অন্ধকারে নামায পড়া চাই। পরিহিত পোশাকের প্রতি আকর্ষণ থাকা চাই না, অথবা এমন পোশাক পরিধান করে নামায পড়া চাই, যার প্রতি মনে আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। কেননা লেবাসের চাকচিক্যের প্রতি দৃষ্টি পড়লে নামাযের খুশু-খুজূ অক্ষুন্ন থাকতে পারে না।

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ জাহ্‌মের দেওয়া একখানি সুন্দর ও চমৎকার চাদর পরিধান করে নামায পড়েছেন; কিন্তু নামায শেষ করার পর তৎক্ষণাৎ তা' খুলে ফেললেন এবং বললেনঃ 'তোমরা এ চাদরখানি আবূ জাহ্‌মকে ফেরৎ দাও, কেননা, এটা আমাকে নামাযের ভিতর অনেকটা অন্যমনস্ক করে ফেলেছে।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা নির্দেশ প্রদান করলেন, যেন তার জুতার নতুন 'তস্‌মা' পরিবর্তন করে পুরাতন 'তস্‌মা' লাগিয়ে দেওয়া হয়।' এর কারণ ছিল, নামাযের সময় নতুন তস্‌মার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় নামাযের একাগ্রতা ও খুশু-খুজূ নষ্ট হয়ে যায়।

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর বসা ছিলেন, স্বর্ণ হারাম হওয়ার পূর্বে তার অঙ্গুলিতে যে আংটি ছিল, তা' তিনি খুলে দূরে নিক্ষেপ করে বললেন,—এটি আমাকে আল্লাহ্ থেকে প্রায় অন্যমনস্ক করে ফেলে। আবার কখনও আমার দৃষ্টি এটার উপরে

পড়ে, আবার কখনও তোমাদের উপর। অর্থাৎ,—তোমাদের সাথে কথা বলার জন্যেও একাগ্রচিত্তে মনোযোগী হতে পারছি না।

হযরত আবু তাল্হা (রাযিঃ) একদা তার নিজস্ব একটি বাগানে নামায আদায় করছিলেন। বাগানটি ছিল খুবই উন্নত, তাতে ফলের বৃক্ষ ছিল খুবই ঘন ঘন। হঠাৎ একটি পাখী বাগানে আটকা পড়ে বাইরে যাওয়ার পথ তালাশ করছিল ; কিন্তু ঘন বৃক্ষের কারণে সম্ভব হচ্ছিল না। হযরত আবু তাল্হার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি ভুলে গেলেন যে, কত রাকাত নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি হুযুরের দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করে আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এ বাগানটি আমি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিলাম, আপনি যে কাজে ভাল মনে করেন এটিকে ব্যবহার করুন।'

আরও এক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—তাঁর প্রচুর খেজুরবৃক্ষের একটি বাগান ছিল। প্রতিটি বৃক্ষে পাকা খেজুর ধরেছিল। একদা নামাযের সময় বাগানের মালিকের দৃষ্টি সেদিকে যাওয়ায় তিনি নামাযের রাকাত সংখ্যা ভুলে গেছেন ; অতঃপর তিনি হযরত উসমান (রাযিঃ)-এর নিকট হাজির হয়ে গোটা বাগান আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিলেন এবং হযরত উসমানকে বললেন,—'আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন, এ বাগানটিকে দ্বীনের খেদমতে ব্যবহার করুন। অতঃপর হযরত উসমান বাগানটিকে পঞ্চাশ হাজারে বিক্রি করে দ্বীনের কাজে লাগিয়েছেন।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'নামাযের ভিতর এ চারটি কাজ অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় ঃ এক, নামাযে অন্যমনস্ক হওয়া। দুই, নামাযরত অবস্থায় মুখমণ্ডলে হাত বুলানো। তিন, কঙ্কর সরানো। চার, মানুষের আসা-যাওয়ার পথকে সম্মুখে রেখে নামায আরম্ভ করা।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلٌ عَلَى الْمُصَلِّيْ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ـ

'নামাযরত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যমনস্ক না হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন।'

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন মনে

হতো যেন একটি প্রোথিত স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে।' কোন কোন সাহাবীর নামাযের অবস্থা এই ছিল যে, যখন রুকু'তে যেতেন, তখন এমন অনড় ও শান্ত হতেন, যেন পাখীরা জড়-পাথর মনে করে তাদের পিঠের উপর এসে বসে পড়বে। বস্তুতঃ শরীয়তের হুকুম ছাড়াও সরল স্বভাব ও যুক্তির তাগিদও তাই ; পার্থিব রাজদরবারে উপস্থিত হলে যদি সুশান্ত ও বিনয়ী থেকে সেই দরবারের যথার্থ মর্যাদা পালন করা হয়, তা' হলে মহান রাব্বুল-আলামীনের পবিত্র দরবার সেজন্য অধিকতর যোগ্য, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

পবিত্র তাওরাত গ্রন্থে আছে,—'হে আদম সন্তান! আমার সম্মুখে যখন দণ্ডায়মান হও, তখন বিনয়ের সাথে এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় দণ্ডায়মান হও। কেননা আমি আল্লাহ্ তোমার প্রভু ; আমি তোমার অন্তর থেকেও তোমার অধিক নিকটবর্তী।'

একদা হযরত উমর (রাযিঃ) মিম্বরে বসে জনসমক্ষে বক্তব্য রেখে বলেছেন, বহু লোক এমন রয়েছে, যারা ইসলামের উপর জীবন অতিবাহিত করে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছে ; তবুও তারা নিজেদের নামায ঠিক করতে পারে নাই। অর্থাৎ,—খুশু-খুজূ ও হুযুরে কাল্বের অভাবে নামাযে তারা প্রাণবন্ততা আনতে পারে নাই।

হযরত আবুল-আলিয়া (রহঃ)-কে নিম্নের এ আয়াতটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

'যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে খবর।' (মাউন ঃ ৫)

তিনি বলেছেন ঃ অত্র আয়াতে ওইসব লোকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা নিজেদের গাফিলত ও অমনোযোগের কারণে নামাযে রাকাতের সংখ্যা ভুলে যায় ; স্মরণ থাকে না যে, দুই রাকাত পড়েছে কি তিন রাকাত।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ উক্ত আয়াতে ওইসব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা গাফলতি করে নামাযের সময় পার করে দেয় ; 'সাহূন' শব্দটির এটাই মর্ম।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لا ينجو منى عبدى الا باداء ما افترضته عليه۔

'বান্দার উপর আমি যেসব ইবাদত ফরয করেছি, সেগুলো আদায় না করা পর্যন্ত সে আমার আযাব হতে রক্ষা পাবে না।'

অধ্যায় ঃ ২০

গীবত ও চুগলখোরী

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গীবত ও পরনিন্দার দোষ ও ক্ষতিকর হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। গীবতকারী ব্যক্তিকে আপন ভাইয়ের মৃতদেহের গোশ্ত ভক্ষণকারীর সাথে উপমা দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط

'তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর।' (হুজুরাত ঃ ১২)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ۔

'এক মুসলমানের হক বিনষ্ট করা অপর মুসলমানের উপর হারাম— রক্তপাত করা, সম্পদ লুণ্ঠন করা, অপমান করা সবই হারাম।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَاِنَّ الْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا -

'তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য।'

গীবতের উক্তরূপ জঘন্যতার কারণ হচ্ছে,—মানুষ ব্যভিচার করে আল্লাহ্র কাছে সনিষ্ঠ তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা' কবূল করেন। কিন্তু গীবত হচ্ছে হক্কুল–এবাদ ; বান্দা যে পর্যন্ত ক্ষমা না করবে পাপীর এই পাপ

মোচন হবে না। গীবতকারী ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে,—যেমন কোন ব্যক্তি তোপ বা আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা চক্ষু বন্ধ করে চতুর্দিকে গোলা-বারুদ ছুঁড়ছে। বস্তুতঃ এভাবেই সে স্বীয় পুণ্য ও নেক আমলকেও ধ্বংস করছে। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন গীবতকারী ব্যক্তিকে জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আগুনের দহনে তার অন্তর গীবতের কলুষ হতে বিমুক্ত না হয়।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ 'গীবত হচ্ছে কারো অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে এমনসব কথাবার্তা বলা, যেগুলো শুনলে সে অপছন্দ করবে।' এসব দোষচর্চা সে ব্যক্তির দেহ, বংশ, কথা, কাজ, ধর্ম, দুনিয়া, আখেরাত, এমনকি তার পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আরোহণের জন্তুর সাথে সম্পর্কিত হলেও তা' গীবত বলে পরিগণিত হবে।

আদর্শ পূর্বসুরীদের একজন বলেছেন,—যদি এ কথা বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তির গায়ের পোশাকটি লম্বা অথবা খাটো, তা' হলে এটাও গীবতের মধ্যে গণ্য করা হবে। অতএব ব্যক্তির পোশাক সম্পর্কে এতটুকু বলার দ্বারা যদি গীবত হয়, তা' হলে স্বয়ং ব্যক্তির দোষচর্চা ও সমালোচনা করা কত জঘন্য ও মারাত্মক হবে!

বর্ণিত আছে,—একদা বেটে একজন মহিলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কোন প্রয়োজনে উপস্থিত হয়। প্রয়োজন শেষে মহিলা বিদায় নেওয়ার পর হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন, 'মহিলাটি কি বেটে!' হুযূর বললেন ঃ 'হে আয়েশা! এ দ্বারা তুমি সেই মহিলার গীবত করলে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমরা অপরের গীবত করা থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা কর। কারণ, গীবতের ভিতর তিনটি মারাত্মক আপদ রয়েছে ঃ এক, গীবতকারী ব্যক্তির দো'আ কবুল হয় না। দ্বিতীয়, তার কোন নেক আমল আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তৃতীয়, তাকে অসংখ্য পাপরাশির বোঝা বহন করতে হয়।'

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ক্বিয়ামতের দিন চুগলখোর ব্যক্তির অবস্থা নিকৃষ্টতম হবে, দুনিয়াতে সে কিছু লোকের কাছে এক প্রকার বলতো, অন্যদের কাছে সে পূর্বের বিপরীত বলে

ফেতনা সৃষ্টি করতো—এ ধরণের দু'মুখা লোকদের শাস্তিস্বরূপ তাদের দু'টি আগুনের জিহ্বা হবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ـ

'চুগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে বহু মাখ্লুক সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকে জিহ্বা দিয়েছেন ; তন্মধ্যে কিছু এমন যারা বুঝিয়ে বলতে পারে আর কিছু পারে না ; কিন্তু মাছের মুখে কোন জিহ্বা নাই—এর কারণ কি? উত্তর,—এর কারণ হচ্ছে,—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করার পর ফেরেশ্তাদের হুকুম করলেন তাকে সিজদা করতে। তখন এক ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো। আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতে বিতাড়িত করলেন। অতঃপর সে সমুদ্রের দিকে গমন করে। সেখানে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয় মাছের সাথে। মাছকে আদম সৃষ্টির সংবাদ শুনিয়ে ইবলীস বললো,—'তিনি সমুদ্র এবং স্থলভাগের প্রাণীদেরকে শিকার করবেন।' ইবলীসের মুখে এ কথা শুনে মাছ সমুদ্রের অপরাপর প্রাণীদেরকে উক্ত সংবাদ জানিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মৎস্যকে জিহ্বা থেকে বঞ্চিত করে দেন।

হযরত আমর ইব্নে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ জনৈক মদীনাবাসী লোকের এক ভগ্নি মদীনার অদূরেই এক জনপদে বাস করতো। একদা ভগ্নি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পর থেকে সে প্রতিদিন সেবা-শুশ্রূষার জন্য ভগ্নির খেদমতে হাজির হতো। একদিন হঠাৎ সেই ভগ্নি মারা যায়। মৃত্যুর পর তাকে যথারীতি দাফন করা হয়। কিন্তু দাফনের পর ভাইয়ের মনে আসলো, ভুলবশতঃ টাকার একটি থলিও মাটিতে দাফন করা হয়ে গেছে। প্রতিবেশী একজনের সহযোগিতায় থলিটি উঠিয়ে নেওয়া হয় ; কিন্তু তখন তারা প্রত্যক্ষ করে যে, কবরের ভিতরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভাই তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে মা'কে ভগ্নির আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মা' বললো,—তোমার বোন পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়ে গোপনে তাদের কথাবার্তা শুনে অন্যদের

কাছে সে কথা পৌঁছিয়ে চুগলখোরী করতো।' একথা শুনে ভাই বুঝতে পারলো,—কবরে ভগ্নির আযাব কেন হচ্ছে। অতএব যে ব্যক্তি কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, সে যেন কখনও গীবত ও চুগলখোরীতে লিপ্ত না হয়।

একদা হযরত আবুল্লাইস বুখারী (রহঃ) হজ্জের উদ্দেশে সফরে বের হলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর দু'টি মাত্র দেরহাম। তিনি কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন,—'হজ্জের এই পবিত্র সফরে বাড়ীতে ফেরা পর্যন্ত সময়ের কোন এক মুহূর্তেও যদি আমি দোষ-চর্চায় লিপ্ত হই, তা' হলে অবশ্যই আমি উক্ত দুই দেরহাম আল্লাহ্‌র রাস্তায় খয়রাত করে দিবো।' তাঁর প্রতিজ্ঞা এতোই দৃঢ় ছিল যে, তিনি হজ্জের সম্পূর্ণ সফর সুচারুরূপে সম্পন্ন করে বাড়ী ফিরে এলেন এবং তাঁর দেরহাম দু'টি পকেটেই রয়ে গেল। অর্থাৎ,—এই দীর্ঘ সফরে তিনি কারও গীবতে লিপ্ত হন নাই। হযরত ইব্‌নে দীনারকে গীবতের ব্যাপারে উক্তরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন ঃ 'আমার বিশ্বাস যে, একশতবার ব্যভিচার করা যত জঘন্য, একবার গীবত করা তার চাইতে অধিকতর জঘন্য।

আবু হাফ্‌স কবীর (রহঃ) বলেন,—'এক রমযান মাস রোযা না রাখা এতটুকু জঘন্য নয়, যতটুকু জঘন্য একজন লোকের গীবত করা।' তিনি আরও বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন আলেম বা ধর্মজ্ঞানী লোকের গীবত করবে, সে ক্বিয়ামতের দিন এভাবে উত্থিত হবে যে, তার মুখমণ্ডলে লেখা থাকবে ঃ 'এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত।'

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন,—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ মি'রাজের রাত্রিতে আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেছিলাম, যারা (মর্মান্তিক শাস্তিস্বরূপ) নিজেদের মুখমণ্ডল বিরাটকায় ধারালো নখের দ্বারা আঁচড়াতে ছিল এবং গলিত পচা লাশ ভক্ষণ করছিল। জিব্‌রাঈলকে এদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বললেন ঃ 'এরা দুনিয়াতে (অন্যের গীবত করে) মরা লাশের গোশ্‌ত ভক্ষণ করতো।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন,—'দেহের জন্য দুম্বল (মারাত্মক ফোঁড়া) যতটুকু ক্ষতিকর, মু'মিন ব্যক্তির জন্য অপরের গীবত করা তদপেক্ষ বহুগুণ

বেশী ক্ষতিকর।'

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন,—'মানুষের অবস্থা এই যে, অন্যের দোষ দেখতে গিয়ে কারও চোখে যদি সামান্য কণা পড়ে, তাও বড় আকারে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু নিজের বেলায় বৃক্ষকাণ্ডটিও ছোট করে দেখা হয়।'

এক সফরে হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) হযরত উমর ও আবু বকরের সঙ্গে ছিলেন এবং প্রয়োজনে তিনিই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতেন। এক স্থানে পৌছার পর হযরত সালমান খানার প্রয়োজন দেখা তিনি রন্ধন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে খাওয়ার কিছু নিয়ে আসতে হযরত সালমানকে পাঠালেন ; কিন্তু সেখানেও কিছু ছিল না। তখন হযরত আবু বকর ও উমর মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'সে যদি কোন কুঁয়ার ধারেও যায়, তবুও সেটাকে শুষ্ক পাবে।' এ কথার উপর পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .... فَكَرِهْتُمُوهُ

'তোমাদের কেউ কারও গীবত করো না........। (হুজুরাত ঃ ১২)

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারও (গীবত করে তার) গোশ্‌ত ভক্ষণ করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্মুখে গীবতকৃত ব্যক্তির গোশ্‌ত পেশ করে বলা হবে, 'এই নাও দুনিয়াতে যার জীবিত অবস্থায় গোশ্‌ত ভক্ষণ করেছিলে, এখন তার মৃতদেহের গোশ্‌ত ভক্ষণ কর।' অতঃপর তাকে এই পচা গোশ্‌ত খেতে বাধ্য করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا (তোমরা কেউ কি স্বীয় মৃত ভ্রাতার মাংস খেতে পছন্দ করবে?)

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে গীবতের দুর্গন্ধ অনুভব করা যেতো, কারণ তখন গীবতের অস্তিত্ব ছিল খুবই কম। কিন্তু এখনকার সময় গীবতের প্রাদুর্ভাবের কারণে লোকজন এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে, এর দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। যেমন কোন

অনভ্যস্ত ব্যক্তি চামড়ার গুদামে গমন করে, তা'হলে দুর্গন্ধের কারণে সেখানে কিছু সময়ও অবস্থান করতে পারে না ; কিন্তু চামড়া শুষ্ককারী ব্যবসায়ীদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত, তারা চামড়ার উপর বসে খাওয়া-দাওয়া করছে, তবুও অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কোনরূপ দুর্গন্ধ অনুভব করছে না, গীবতের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন,—আমি কোন আসমানী গ্রন্থে পড়েছি ঃ 'গীবত এমন এক জঘন্য অভ্যাস, যদি কেউ এ থেকে তওবা করে মারা যায়, তবুও সে সকলের শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যদি গীবতের গুনাহে লিপ্ত থেকে মারা যায়, তা'হলে সে জাহান্নামে সর্বপ্রথম প্রবেশকারীদের মধ্যে হবে।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

'প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ।' (হুমাযাহ ঃ ১)

অর্থাৎ,—এহেন লোকদের শাস্তি খুবই মর্মন্তুদ। 'হুমাযাহ' অর্থ,— অসাক্ষাতে নিন্দাবাদকারী আর 'লুমাযাহ্' অর্থ,—সাক্ষাতে নিন্দাবাদকারী।

উপরোক্ত আয়াতখানি ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, সে আল্লাহ্‌র রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে নিন্দাবাদ করতো। আয়াতখানি যদিও এক ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে ; কিন্তু এর উদ্দেশ্য সকলের জন্য ব্যাপক।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমরা গীবত থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাক ; পুরাপুরিভাবে তা' পরিহার কর, কেননা, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য। কারণ, ব্যভিচারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন ; কিন্তু গীবতের জন্য গীবতকৃত ব্যক্তির মার্জনা ব্যতীত আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। অতএব, গীবত করে থাকলে প্রথমতঃ বান্দার নিকট থেকে মাফী হাসিল করা উচিত, সেই সঙ্গে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে তওবা করা চাই, যাতে আল্লাহ্‌র হুকুমের অমান্যতাও মাফ হয়ে যায়। তাহলেই পূর্ণ মুক্তির আশা করা যেতে পারে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ 'ক্বিয়ামতের দিন গীবতকারী ব্যক্তির চেহারা পিছন দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

গীবতকারী ব্যক্তির উচিত,—মজলিস থেকে উঠার পূর্বেই তওবা ও এস্তেগফার করা, যাতে যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছে নিন্দাবাদ পৌছার পূর্বাহ্নেই তওবা হয়ে যায় ; এভাবে তার তওবা শীঘ্র কবুল হবে। অন্যথায় বান্দা মাফ না করা পর্যন্ত তার এই অপরাধ ক্ষমা হবে না।

অনুরূপ যদি কেউ কোন বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তা'হলে কেবল তওবা করলেই গুনাহ্ মোচন হবে না, যাবৎ সেই মহিলার স্বামী তাকে ক্ষমা না করবে।

অনন্তর নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ যদি কেউ পরিহার করে থাকে, তা'হলে তা' থেকে তওবা করতে হবে এবং সেইসঙ্গে অতীত জীবনের পরিত্যক্ত সবগুলোকে ক্বাযা করতে হবে, তবেই আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমার আশা করা যেতে পারে।

অধ্যায় ঃ ২১

যাকাতের বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

'যারা যাকাত দান করে থাকে (তারা সফলকাম হয়ে গেছে)।'

(মু'মিনূন ঃ ৪)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিকের উপর যাকাত ফরয হওয়ার পর সে যদি যাকাত প্রদান করতঃ সম্পদের হক আদায় না করে, তা'হলে ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদ একত্র করে আগুনের পাত বানানো হবে এবং সেই পরিমাণে তার শরীরকে প্রশস্ত করা হবে। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা সেই পাতকে উত্তপ্ত করে তার পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। যখন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখন পুনরায় উত্তপ্ত করে অনুরূপ দাগ দেওয়া হবে এবং এভাবে উপর্যুপরি এক দিবস হতে থাকবে, যে দিবসটির দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাজার বছরকাল হবে। অতঃপর হিসাব-কিতাব শুরু হবে এবং নিজ প্রাপ্য স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে যাবে।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং ব্যয় করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা' উত্তপ্ত করা হবে এবং এর দ্বারা ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে,) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।' (তওবা ঃ ৩৪, ৩৫)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'ক্বিয়ামতের দিন ধনী লোকদের ধ্বংস ও আফসূসের সীমা থাকবে না, যাদের উপর যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও গরীব-মিসকীনের হক তারা নষ্ট করেছে।' হকদার গরীব ও ফকীর মিসকীনরা সেদিন আল্লাহ্র দরবারে নালিশ করে বলবে,—'এরা আমাদের হক আদায়ের ব্যাপারে আপনার আরোপিত ফরয পরিত্যাগ করে আমাদের উপর জুলুম করেছে।' আল্লাহ্ বলবেন,—'আমার সম্মান ও প্রতাপের কসম, আমি তাদের থেকে অবশ্যই তোমাদের হক আদায় করবো এবং তাদেরকে আমার রহমত থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করবো।' অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

'এবং যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক আছে যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের (তারা মুক্তি পাবে)।' (মা'আরিজ ঃ ২৪,২৫)

রেওয়ায়েতে আছে,—হুযূর সাল্লাল্লাহু মি'রাজের রাত্রিতে জঘন্য শাস্তিপ্রাপ্ত কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে ছেঁড়া ও জীর্ণ কাপড়ের টুকরা লাগিয়ে রাখা হয়েছে, চতুষ্পদ জানোয়ারের মত জাহান্নামের উত্তপ্ত গরম ও কন্টকপূর্ণ জঙ্গলে তারা চরছে। আল্লাহ্র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা ওইসব লোক যারা যাকাত আদায় করতো না ; অথচ তাদের উপর যাকাত ফরয ছিল ; বস্তুতঃ এদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রকার জুলুম করেন নাই ; তিনি জুলুম হতে পবিত্র।

সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী তাবেয়ী যুগের কয়েকজন বুযুর্গ হযরত আবূ সিনান (রাযিঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হোন। পরক্ষণেই তিনি বললেন,—'চলুন, আমাদের একজন প্রতিবেশীর ভাইয়ের ইনতেকাল হয়েছে ; তার প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে আসি।' ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বুযুর্গ মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ ফিরয়াবী বলেন ঃ 'অতঃপর আমরা সকলেই যখন সেই প্রতিবেশীর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম, তখন সে সজোরে চিৎকার করে বিলাপ করছিল—মনে হচ্ছিল যে দুঃখে তার কলিজা ফেটে যাবে। আমরা সকলেই তাকে বিভিন্ন ভাবে প্রবোধ দিচ্ছিলাম ; কিন্তু সে শান্ত হচ্ছিলো না। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—'তুমি কি জানো না? মৃত্যু সকলের জন্য এক অবধারিত সত্য, তারপরেও তুমি এভাবে রোদন করছো কেন?' সে বললো,—'অবশ্যই আমি তা' জানি ; কিন্তু আমার ভাইয়ের দিবা-রাত্রি অবিরত আযাব হচ্ছে।' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এ বিষয়ে তুমি কি করে জানলে? সে বললো,—'আমার ভাইকে দাফন করার পর সকলেই কবরের পার্শ্ব থেকে চলে যায় ; কিন্তু আমি একাকী সেখানে বসেছিলাম, হঠাৎ কবরের ভিতর থেকে আওয়ায আসলো,—'হায়! সকলেই আমাকে ছেড়ে চলে গেলো ; আমাকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ; অথচ আমি নিয়মিত নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি।' একথা শুনে আমি কাঁদতে আরম্ভ করলাম। তৎক্ষণাৎ কবরের উপর থেকে মাটি সরিয়ে দেখি,—ভিতরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে এবং ভাইয়ের গলদেশে আগুনের বেড়ী লাগিয়ে রাখা হয়েছে। ভাইয়ের কষ্টে অস্থির হয়ে সমবেদনায় আমি তার গলদেশ থেকে আগুনের বেড়ীটি খুলে ফেলার জন্য হাত বাড়ালাম, সাথে সাথে আমার অঙ্গুলি ও হাত পুড়ে গেল ; এই দেখুন অবস্থা।' আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করলাম, আগুনে দগ্ধ হয়ে তার হাত কালো হয়ে গেছে। সে আরও বলতে লাগলো,—তারপর অপারগ হয়ে কবরে পুনরায় মাটি দিয়ে আমি ফিরে আসলাম। এখন আপনারাই বলুন, আমি কেন রোদন করবো না? আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার ভাই দুনিয়াতে এমন কি পাপ করতো? সে বললো,—'আমার ভাই দুনিয়াতে মাল-সম্পদের যাকাত দিতো না।' আমরা বললাম,—এক্ষেত্রে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মই বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এমন ধারণা না করে যে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।' (আলি-ইমরান ঃ ১৮০)

আর তোমার ভাইকে ক্বিয়ামতের পূর্বেই আযাব দিয়ে শেষ করে নেওয়া হচ্ছে। অতঃপর আমরা সেখান থেকে প্রস্থান করে সাহাবী হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনা উল্লেখপূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে, ইহুদী-খৃষ্টানদের মৃত্যুর পর আমরা এ ধরণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি না ; অথচ মুসলমানের ব্যাপারে তা প্রত্যক্ষ করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ ইহুদী-খৃষ্টানদের জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই ; সেজন্যে ঈমানদার লোকদের ব্যাপারে কদাচিৎ এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সতর্ক করেন এবং শিক্ষা প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

'অতএব যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।' (আন'আম ঃ ১০৪)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যাদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে, তারা যদি যাকাত আদায় না করে, তা' হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তারা ইহুদী-নাসারাদের পর্যায়ভুক্ত, অনুরূপ যারা 'উশর' বা উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ প্রদান করে না তারা মজূসী তথা অগ্নিপূজকদের পর্যায়ভুক্ত। আর যারা উভয় প্রকারের কোনটাই আদায় করে না, তারা ফেরেশ্‌তা এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক

অভিশপ্ত। তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) আরও বলেন ঃ সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে যাকাত ও উশর প্রদান করে ; ক্বিয়ামতের দিবস তার কোন প্রকার শাস্তি হবে না। কবরের আযাব তার মাফ হয়ে যাবে, তার দেহ জাহান্নামের উপর হারাম করে দেওয়া হবে, বিনা হিসাবে সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিবস তার কোনরূপ পিপাসা দেখা দিবে না।

অধ্যায় ঃ ২২

জেনা বা ব্যভিচার

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

'এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, (তারা সফলকাম হয়ে গেছে)। (মু'মিনূন ঃ ৫)

অর্থাৎ,—নিজেদের লজ্জাস্থানকে যারা (অশ্লীল ও গর্হিত কার্যাবলী হতে সংরক্ষণ করে, তারা সফলকাম।

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج

'নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য।' (আন'আম ঃ ১৫১)

অর্থাৎ,—সর্বপ্রকার অশ্লীল ও লজ্জাকর কাজ থেকে দূরে থাক। চাই সেটা বড় হোক কিংবা ছোট ধরণের হোক যেমন জেনা-ব্যভিচার, পর মহিলাকে চুম্বন করা, তাকে স্পর্শ করা, তার প্রতি কামাতুর দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'মানুষের হাত, পা এবং চোখের দ্বারাও জেনা হয়।' তাই আল্লাহ্ পাক হুকুম করেছেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط

'মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের

যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে।' (নূর ঃ ৩০)

আল্লাহ্ তা'আলা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন স্বীয় চোখের সাহায্যে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সংযত থাকে। অনুরূপ লজ্জাস্থানকে সর্ববিধ গর্হিত ও অশ্লীল ক্রিয়া-কর্ম থেকে হেফাযত করে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকখানি আয়াতে জেনা ব্যভিচারের নিষিদ্ধতা ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝

'যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।' (ফুরকান ঃ ৬৮)

অর্থাৎ,—এহেন লোকদেরকে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। 'আছাম' জাহান্নামের একটি অংশের নাম। কেউ কেউ বলেছেন,—'আছাম' হচ্ছে জাহান্নামের একটি গহ্বর ; যখন এর মুখ খোলা হয়, তখন দোযখবাসীরা সেই গহ্বরের দুর্গন্ধে দিশাহারা হয়ে বিকট আওয়াযে চিৎকার করতে থাকে।

এক সাহাবী বলেন ঃ 'তোমরা সর্বদা জেনা থেকে পরহেয কর এবং এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন কর। কেননা, জেনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি ছয় প্রকার আপদ ও ক্ষতিতে পতিত হয়। তন্মধ্যে তিন প্রকার দুনিয়াতে এবং অপর তিন প্রকার আখেরাতে। দুনিয়ার তিন প্রকার হচ্ছে,—এক, রোযী-রোযগারে অভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয়, আয়ু কমে যায় অথবা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওবা নসীব হয় না। তৃতীয়, চেহারা কালো হয়ে যায়। অপর তিন প্রকার আপদ—যা আখেরাতে দেখা দিবে তা' হলো,—এক, আল্লাহ্ তা'আলা রাগান্বিত থাকবেন। দ্বিতীয়, হিসাব-নিকাশে কঠোরতা করা হবে। তৃতীয়, সে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আরজ করেছিলেন,—'ইয়া রব্ব্! ব্যভিচারী ব্যক্তির শাস্তি কি?' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তাকে আগুনের এমন একটি পোষাক পরিয়ে দেওয়া হবে, যদি সেই পোষাক কোন বিরাটকায় পর্বতের উপর রাখা হয়, তা' হলে সেই পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

কথিত আছে, ইবলীস শয়তান একজন অসতী মহিলাকে এক হাজার

অসৎ পুরুষ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করে।

'আল-মাসাবীহ' গ্রন্থে আছে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْاِيْمَانُ وَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهٖ كَالظُّلَّةِ فَاِذَا خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ اِلَيْهِ الْاِيْمَانُ ـ

'যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে, তখন তার অন্তর হতে ঈমান বের হয়ে আসে এবং তার মাথার উপর ছত্রের ন্যায় অবস্থিত থাকে ; অতঃপর যখন সে উক্ত অপকাজ হতে বিরত হয়, তখন ঈমান তার নিকট প্রত্যাবর্তন করে।'

'আল-ইকনা' কিতাবে আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্র নিকট মানুষের এর চাইতে বড় গুনাহ্ আর হতে পারে না যে, সে এমন কোন গর্ভাশয়ে বীর্যপাত করবে, যা তার জন্য বৈধ ও হালাল নয়।'

এর চাইতে অধিকতর জঘন্য অপরাধ হলো, সমকামিতা বা পুং মৈথুন। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সমকামিতায় লিপ্ত হবে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না ; অথচ পাঁচ বছরের দূরত্ব হতেও জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমর (রাযিঃ) একদা আপন গৃহের দরজার পার্শ্বে বসা ছিলেন। এমন সময় সুন্দর সুশ্রী একটি বালকের উপর তাঁর দৃষ্টি পতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখান থেকে উঠে গৃহে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলেন,—কিহে, সেই ফেতনা কি এখনো আছে, না চলে গেছে? আরজ করা হলো, 'চলে গেছে।' অতঃপর তিনি দরজা খুলে বাহিরে আসলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো,—' হে আবদুল্লাহ! আপনি কি এ ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূলের পবিত্র যবানে কোন হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ 'খবরদার! এ বয়সের বালকদের প্রতি দৃষ্টি করা হারাম, তাদের সাথে কথা বলা হারাম, তাদের সাথে উঠা-বসাও হারাম।'

কাজী ইমাম (রহঃ) বলেছেন,—আমি এক বুযুর্গকে বলতে শুনেছি যে, একজন স্ত্রীলোকের সাথে শয়তান থাকে একটি ; কিন্তু একজন বালকের সাথে শয়তান থাকে আঠারোটি।'

বর্ণিত আছে,—যে ব্যক্তি কোন বালককে কামাতুর হয়ে চুম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাঁচশত বছর পর্যন্ত শাস্তি দিবেন। আর কোন স্ত্রীলোককে কামাতুর হয়ে চুম্বন করা সত্তরজন কুমারীকে ধর্ষণ করা অপেক্ষাও জঘন্য। অনুরূপ যদি কেউ একজন কুমারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তা' হলে সে যেন সত্তর হাজার বিবাহিতা মহিলার সাথে জেনা করলো।'

'রওনাকুত্-তাফাসীর' গ্রন্থে ইমাম কাল্বী (রহঃ) থেকে বর্ণিত,—সর্বপ্রথম লূত জাতির অপকর্মটির (পুং মৈথুন) সূচনা করেছে চির অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান। সে একটি সুন্দর-সুশ্রী কিশোর বালকের আকৃতি অবলম্বন করে লূত জাতির কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর তারা ইবলীসের সাথে সর্বপ্রথম কুকর্মে লিপ্ত হয়। তারপর থেকে প্রত্যেক নবাগত মুসাফিরের সাথেই তাদের উক্ত কর্ম চলতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করার জন্য হযরত লূত আলাইহিস্ সালামকে প্রেরণ করেন তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে উক্ত কুকর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন এবং একনিষ্ঠ চিত্তে এক আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দেন, কিন্তু তারা বিরত হয় নাই। অতঃপর হযরত লূত তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব ও গজবের ভয় প্রদর্শন করেন। তাতেও অসভ্যরা সেই কর্ম থেকে বিরত না হয়ে বরং আল্লাহ্র নবীকে বলতে লাগলো ঃ 'তুমি যদি সত্য নবী হয়ে থাক, তা' হলে আমাদের উপর আল্লাহ্র গজব নাযিল করে দেখাও।' অবশেষে হযরত লূত আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র কাছে এই বলে দো'আ করলেন ঃ

رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

'প্রভু! আমাকে এই দুর্বৃত্ত জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।'

আল্লাহ্ তা'আলা আসমানকে হুকুম করলেন লূত জাতির উপর পাথর বর্ষণ করতে। প্রতিটি পাথরে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। কুরআনের

ভাষা مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ এর মর্ম এটাই। এভাবে প্রচণ্ড পাথর বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

বর্ণিত আছে, লূত জাতির উপর আল্লাহ্র গজব নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে তাদের একজন লোক ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে মক্কায় গমন করেছিল। আল্লাহ্র গজবের নির্ধারিত একটি পাথর সেই লোকটিকে ধ্বংস করার জন্য মক্কার হেরেম শরীফে উপস্থিত হয় ; কিন্তু হেরেমের সংরক্ষক ফেরেশ্তাগণ পাথরটিকে এই বলে বাধা দিয়েছেন যে, 'হেরেমের ভিতর তাকে তুমি ধ্বংস করতে পারবে না ; এটা সংরক্ষিত ও নিরাপদ এলাকা।' অতঃপর পাথরটি হেরেমের বাইরে প্রত্যাবর্তন করে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে শূন্যালোকে অপেক্ষা করতে থাকে। দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর লোকটি হেরেমের সীমানা থেকে বের হলে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পাথরটি তার মাথায় পতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ লোকটি আল্লাহ্র এই গজবে ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের সাথে তাঁর স্ত্রীও আযাব থেকে বাঁচার জন্য বের হয়ে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ্র হুকুম ছিল কোন ঈমানদার ব্যক্তি যেন গজব নাযিলের সময় পশ্চাতে স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে চোখ ফিরেও না দেখে। তা' সত্ত্বেও হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের স্ত্রী যখন আযাবের ভীষণ গর্জন শুনে পিছন দিকে তাকালেন এবং আফসুস করে বলতে লাগলেন, হায় আমার জাতি! হায় আমার সম্প্রদায়! তখন সাথে সাথে একটি কংকর এসে তাকে চিরতরে ধ্বংস করে দিল।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'পরদিন ভোরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং গোটা বস্তিকে সমূলে উৎপাটন করে স্বীয় ডানার একপার্শ্বে রেখে আকাশের অতি নিকটবর্তী হলেন ; তখন আসমানের ফেরেশ্তাগণ সেই বস্তির মোরগের ডাক ও কুকুরের আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সেখান থেকে গোটা বস্তিকে উল্টিয়ে সজোরে মাটিতে আছ্‌ড়ে মারলেন। এভাবে লূত সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই আযাবে লিপ্ত করে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরা ছিল মোট পাঁচটি নগরের অধিবাসী। তন্মধ্যে 'সাদূম' শহরটি ছিল সর্ববৃহৎ। সূরা বারা'আতে উক্ত শহরের উল্লেখ রয়েছে। এ শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ লক্ষ।

অধ্যায় ঃ ২৩

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও পিতা-মাতার হক

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط

'আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর।' (নিসা ঃ ১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ ۝

'ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।' (মুহাম্মদ ঃ ২২, ২৩)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

'(বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তা' ছিন্ন করে আর দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা যথার্থ ক্ষতিগ্রস্ত। (বাক্বারা ঃ ২৭)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

'এবং যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকা-পোক্ত করার পর তা' ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা' ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্যে রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।' (রা'দ ঃ ২৫)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন সমগ্র সৃষ্টিজগতকে সৃজনের মহান কার্য সমাপ্ত করলেন, তখন আত্মীয়তার রেহেম দাঁড়িয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশংকা করে তা' থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করলো। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে, আমি তার অনুকূলে থাকবো, আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা ছিন্ন করবে, তার থেকে আমি আমার ভালবাসা ছিন্ন করে ফেলবো। আল্লাহ্র এ কথা শুনে রেহেম সম্মতি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। অতঃপর নবীজী কুরআনের একখানি আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে ঃ 'ক্ষমতা লাভ করলে তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরক বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করে দেন।' (মুহাম্মদ ঃ ২২, ২৩)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলে করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'জুলুম-অত্যাচার এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করা অপেক্ষা জঘন্য কোন গুনাহ নাই। এ অপরাধের শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই দেওয়া হবে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

'আত্মীয়তা ছেদনকারী ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না।'

নির্ভরযোগ্য এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,—'বনী আদমের আমল প্রতি জুমার রাত্রিতে পেশ করা হয় ; কিন্তু আত্মীয়তা ছেদনকারীর আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।'

ইব্‌নে হাব্বান প্রমুখ রেওয়ায়াত করেছেন ঃ 'তিন প্রকার লোক বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক, মদ্যপায়ী। দ্বিতীয়, আত্মীয়তা ছেদনকারী। তৃতীয়, যাদু-টোনায় বিশ্বাসী।'

ইমাম আহমদ, ইবনু আবিদ্দুন্‌য়া ও ইমাম বায়হাক্বী রেওয়ায়েত করেছেন যে, এই উম্মতের বেশ কিছু লোকের ব্যাপারে এ ঘটনা ঘটবে যে, একদা রাত্রিতে তারা পানাহার, আনন্দ-উল্লাস ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকবে ; সকল বেলা তাদের চেহারা-ছুরত বানর ও শূকরের আকৃতিতে পরিবর্তন করে মাটিতে পুঁতে দিয়ে তার উপর পাথর বর্ষণ করা হবে। অন্যান্য লোকেরা পরস্পর বলাবলি করবে,—অদ্য অমুক গোত্রকে অথবা অমুক বাড়ীর লোকদেরকে মাটি গ্রাস করে ফেলেছে। এদের অনেকের উপর লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় পাথর বর্ষণ করা হবে আবার অনেকের উপর ধ্বংসাত্মক তুফান ও ঝড়ো হাওয়া চালিয়ে দেওয়া হবে, যেমন আদ জাতির বেলায় করা হয়েছিল, তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে না হয়ে সীমিত আকারে হবে। এরা ওইসব লোক যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করে থাকে, নর্তকী ও গায়িকা নিয়ে বিনোদনে মত্ত থাকে, সুদের লেন-দেন করে, আত্মীয়-স্বজনের হক নষ্ট করে। এখানে আরও এক প্রকার লোকের উল্লেখ ছিল ; কিন্তু বর্ণনাকারী জা'ফর তা' বিস্মৃত হয়ে গেছেন।

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে তশরীফ এনে বলেছেন,—'ওহে মুসলমান!

আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর ; কেননা আত্মীয়তার হক প্রতিপালনের ন্যায় শীঘ্রতর ফলপ্রদ নেক আমল আর দ্বিতীয়টি নাই। অনুরূপ কারও প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা থেকে বিরত থাক ; কেননা জুলুম-অত্যাচার অপেক্ষা শীঘ্রতর নগদ শাস্তি আনয়নকারী পাপ অপরটি নাই। অনুরূপ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের উপকার ও হিত সাধন কর। কেননা মানুষ হাজার বৎসরের ব্যবধান হতে বেহেশ্‌তের সুগন্ধ পাবে ; কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তা ছেদনকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং যে ব্যক্তি অহংকারভরে মাটিতে চাদর হেঁচড়িয়ে চলে, এসব লোক বেহেশ্‌তের সুঘ্রাণ হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকবে।' (তাব্‌রানী আওসাত)

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন,—'অদ্যকার এ মজলিসে আত্মীয়তা ছেদনকারী কোন লোক যেন না বসে।' তৎক্ষণাৎ একজন যুবক মজলিস থেকে উঠে তার খালার নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে—ইতিপূর্বে তাদের পরস্পর মনোমালিন্য ছিল—খালা তাকে মা'ফ করে দেওয়ার পর পুনরায় সে মজলিসে এসে শরীক হয়।' (ইস্‌বাহানী)

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ -

'আত্মীয়তা ছেদনকারী লোকদের উপর কখনও আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া বর্ষিত হয় না ; এরা চিরকাল বঞ্চিত হয়ে থাকে।'

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন,—আত্মীয়তা ছেদনকারী কোন ব্যক্তি যেন এ মজলিশে উপস্থিত না থাকে। মজলিসে উপবিষ্ট এক যুবকের ফুফুর সাথে কয়েক বৎসর যাবৎ মনোমালিন্য ছিল, তৎক্ষণাৎ সে মজলিস হতে উঠে ফুফুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে অন্তর স্বচ্ছ করে নিয়েছে।

হাদীসে আছে, যাদের মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী একজন লোকও থাকে, তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না। (তাব্‌রানী)

হযরত আ'মাশ থেকে বর্ণিত, একদা হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) ফজরের নামাযান্তে বললেন, 'আত্মীয়তা ছিন্নকারী ব্যক্তিকে আমি আল্লাহ্‌র

শপথ করে বলছি, যেন সে অত্র মজলিস থেকে উঠে যায়। কেননা আমরা এখন আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করবো ; দো'আর মজলিসে আত্মীয়তা ছেদনকারী লোক থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা দো'আ কবুল করেন না।' (তাব্‌রানী)

হাদীসে আছে,—'আত্মীয়তার রেহেম আল্লাহ্‌র আরশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত সে বলছে,—আমার বন্ধন যে রক্ষা করবে, আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন, আমার বন্ধন যে ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তাকে ছিন্ন করুন।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি রহমান অর্থাৎ দয়ালু। আত্মীয়তা রেহেম অর্থাৎ দয়ারই নামান্তর। আমার 'রহমান' (দয়া) নাম হতে ছাঁটাই করে এই 'রেহম' নাম সৃষ্টি করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি রেহেম তথা আত্মীয়তার হক পালন করে, আমি তার প্রতি সদয় হই, আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা ছিন্ন করে, আমি তার সাথে আমার ভালবাসা ছিন্ন করে ফেলি।'

হাদীস শরীফে আছে,—'সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম হচ্ছে কোন মুসলমানকে অপমান করা। আর আত্মীয়তার রেহেম রহমানুর রাহীম আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত বৃক্ষশাখা। এটিকে যে ছিন্ন করবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না।' (মুসনাদে আহমদ)

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে,—'রাহমান বৃক্ষের সাথে জড়িত রেহেম আল্লাহ্‌র কাছে নালিশ করে থাকে, ওগো খোদা! আমাকে ছিন্ন করা হয়েছে, ওগো খোদা! আমার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, ওগো খোদা! আমার উপর জুলুম করা হয়েছে, ওগো খোদা! ওগো খোদা!—এভাবে সে আর্তনাদ করতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তুমি কি রাজী নও যে, তোমার সাথে যে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখবে, আমি তার সাথে ভালবাসা বজায় রাখব, আর তোমাকে যে ছিন্ন করে, আমিও তার সাথে মহব্বত ছিন্ন করবো? (আহমদ ও ইব্‌নে হাব্বান)

রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে,—'রেহেম গো-কীট সদৃশ বস্তু, আল্লাহ্‌র আরশকে সে চিমটে ধরে রেখেছে। প্রতিনিয়ত সে তীব্র ভাষায় চিৎকার করে বলছে,—'হে আল্লাহ্! আমার বন্ধন যে রক্ষা করেছে, আপনি তাকে

রক্ষা করুন, আর আমাকে যে ছিন্ন করেছে, আপনি তাকে ছিন্ন করুন। (মুসনাদে বায্‌যার)

মুসনাদে বায্‌যার কিতাবে আরও উল্লেখ হয়েছে,—'আরশের সাথে তিনটি বস্তু ঝুলন্ত অবস্থায় সম্পৃক্ত রয়েছে। এক, রেহেম,—সে বলছে ঃ আয় আল্লাহ্! আমি আপনার সাথে সম্পৃক্ত, আমাকে যেন ছিন্ন না করা হয়।দ্বিতীয়, আমানত,—সে বলছে ঃ আয় আল্লাহ্! আপনার সাথে জড়িত হয়ে রয়েছি, আমাকে যেন খেয়ানত করে পৃথক না করা হয়। তৃতীয়, নে'আমত,—সে বলছে ঃ আয় আল্লাহ্! আমি আপনার সান্নিধ্যে রয়েছি, না-শোকরী করে আমাকে যেন দূরে নিক্ষেপ না করা হয়।

বায়হাক্বী শরীফে আছে,—আরশের নিম্নতলে সীলমোহর লাগানোর সরঞ্জাম রক্ষিত আছে। যখন আত্মীয়তার হক নষ্ট করা হয়, তখন রেহেম আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে আত্মীয়তার হক বিনষ্টকারীর অন্তরে সীলমোহর লাগিয়ে দেন। পরিণামে সে হতবুদ্ধি ও জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং হাশরের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানের আতিথেয়তা করে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে এবং তার উচিত যেন কথা বললে ভাল কথা বলে, নতুবা খামোশ থাকে।'

আরও বর্ণিত হয়েছে,—'যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও সচ্ছল জীবিকা কামনা করে, সে যেন আত্মীয়তার হক পালন করে।' (বুখারী, মুসলিম)

বুখারী ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'তোমরা নিজেদের বংশ-পরম্পরা শিক্ষা করে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নাও এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা, আত্মীয়তার হক প্রতিপালনে পারস্পরিক ভালবাসা

বৃদ্ধি পায়, সম্পদে প্রাচুর্য আসে এবং আয়ু দীর্ঘ হয়।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُمَدَّ لَهُ فِىْ عُمْرِهٖ وَيُوَسَّعَ لَهُ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيْتَةَ السُّوْءِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ـ

'যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও স্বচ্ছল জীবিকা কামনা করে এবং অপমৃত্যু হতে আত্মরক্ষা করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং আত্মীয়তার হক পালন করে।' (বায্‌যার, হাকেম, যাওয়ায়েদুল-মুসনাদ)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তওরাত গ্রন্থে লিখিত রয়েছে যে, দীর্ঘায়ু ও স্বচ্ছল জীবিকা কামনাকারী ব্যক্তি যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে।' (বায্‌যার, হাকেম)

আবূ ইয়'লা মাওসেলী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'দান-খয়রাত এবং আত্মীয়তার হক প্রতিপালনের দ্বারা আল্লাহ্ তা'অলা দীর্ঘায়ু দান করেন, অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করেন এবং আপদ-বিপদ দূরীভূত করেন।'

আবূ ইয়া'লা মাওসেলী (রহঃ) আরও রেওয়ায়াত করেন ঃ 'খাস্'আম' গোত্রের একজন লোক বর্ণনা করেছেন, একদা আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'ঈমান।' আমি বললাম, অতঃপর? তিনি বললেন ঃ 'আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'শির্‌ক।' আমি বললাম, অতঃপর? তিনি বললেন ঃ 'আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।' আমি বললাম, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'অসৎ কাজে উৎসাহিত করা এবং সৎকাজে বাধা সৃষ্টি করা।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—একদা জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উষ্ট্রীর লাগাম ধরে ফেললো। আল্লাহ্‌র রাসূল তখন সফররত অবস্থায় ছিলেন। লোকটি

জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমলের নির্দেশনা করুন, যদ্দ্বারা আমি দোযখ থেকে বাঁচতে পারি এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর বিরতি করে সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ লোকটির উদ্দেশ্য সৎ। অতঃপর হুযূর লোকটিকে তার জিজ্ঞাসার পুনরাবৃত্তি করতে বললেন। সে আরজ করলে তিনি বললেন ঃ

تَعْبُدُ اللّٰهَ لَاتُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ـ

'তুমি এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তার সাথে কাউকে শরীক করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আত্মীয়তার হক পালন কর।' লোকটি বিদায় নেওয়ার পর হুযূর বললেন ঃ 'যদি সে আমার উপদেশ অনুযায়ী আমল করে, তা'হলে অবশ্যই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।'

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,—'বিনয় ও মহত্ত্ব দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ আনয়ন করে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার দীর্ঘায়ু ও স্বচ্ছল জীবন দান করে।'

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَتْقَاهُمْ لِلرَّبِّ وَاَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ وَاٰمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

'সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে,—যে আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করে, সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদেরকে সৎকাজে উৎসাহিত ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে।' (ইব্‌নে হাব্বান, বায়হাক্বী)

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,—'আমার পরম প্রিয় দোস্ত হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসীয়ৎ করেছেন ঃ এক,—দুনিয়ার ব্যাপারে যারা আমার অপেক্ষা উন্নত, আমি যেন তাদের সাথে নিজেকে তুলনা না করি। দুই,—যারা আমার তুলনায়

কষ্টে এবং অবনত অবস্থায় আছে, আমি যেন তাদের প্রতি দৃষ্টি করে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করি। তিন,—গরীব মিসকীনকে যেন ভালবাসি এবং সর্বদা তাদের নিকটবর্তী হয়ে থাকি। চার,—আত্মীয়-স্বজনকে যেন প্রসন্ন রাখি ; যদিও তারা আমার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। পাঁচ,—দ্বীনের ব্যাপারে যেন কাউকে পরওয়া না করি। ছয়,—তিক্ত হলেও যেন হক কথা বলতে দ্বিধা না করি। সাত,—অধিক পরিমাণে যেন 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করি। কেননা এটি বেহেশতের ধনভাণ্ডারসমূহের একটি।' (তাব্‌রানী, ইব্‌নে হাব্বান)

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'শ্রেষ্ঠতম গুণ কোন্‌টি? আমি কি তোমাদেরকে তা বলে দিবো না? শুন, 'যদি কেউ তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কর, কেউ যদি তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর এবং যদি কেউ তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর।' (তাব্‌রানী)

হাদীস শরীফে আছে,—'সর্বাধিক প্রশংসনীয় ও শ্রেষ্ঠতম আমল হচ্ছে, সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা, বঞ্চিতকারীকে দান করা এবং গালি-গালাজকারীকে ক্ষমা করা।' (তাব্‌রানী)

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক আমলের নির্দেশনা করবো না? সাহাবায়ে কেরাম তীব্র উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

تَحْلُمُ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتُعْطِي
مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ

'যদি কেউ তোমার সাথে মূর্খতা ও গোয়ারতুমীর ব্যবহার করে, তুমি তার সম্মুখে ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে পেশ আস। যদি কেউ তোমার প্রতি জুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। যদি কেউ তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। যদি কেউ তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়, তুমি তাকে

ভালবাসার সূত্রে গেঁথে নাও।' (তাবরানী)

হাদীস শরীফে আছে,—'কারও উপকার ও হিতসাধন করা এমন ইবাদত, যা' সর্বাপেক্ষা শীঘ্র সওয়াবের ভাগী করে। আর কারও প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা এমন পাপ, যা সর্বাপেক্ষা শীঘ্র আযাব ও শাস্তির উপযুক্ত করে তোলে।' (ইব্‌নে মাজাহ্)

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে,—'আত্মীয়তা ছেদন, খিয়ানত ও মিথ্যার চাইতে বড় গুনাহ আর নাই ; এগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তি দুনিয়াতে শীঘ্র নগদ শাস্তি-প্রাপ্ত হয় এবং আখেরাতেও তার শাস্তি পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আত্মীয়তার হক প্রতিপালন এমন পুণ্যকাজ, যার পুরস্কার ও প্রতিফলন দুনিয়াতেই নসীব হয় ; হক প্রতিপালনকারীর ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে বরকত হয় ; যদিও আত্মীয়বর্গ জঘন্য পাপে লিপ্ত থাকে, তথাপি তার বরকতে কোনরূপ ঘাটতি দেখা দেয় না।'

অধ্যায় ঃ ২৪

পিতা-মাতার হক

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা আমি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ 'নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা।' আমি আবার জিজ্ঞাসা করেছি, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ 'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছি, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।' (বুখারী, মুসলিম)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'কোন মানুষই পিতার হক আদায় করতে পারে না, তবে যদি কোন সময় তাঁকে ক্রীতদাস অবস্থায় দেখতে পায় এবং খরিদপূর্বক মুক্ত করে দেয়, তাতে পিতার হক (কথঞ্চিৎ) পালন হতে পারে।'

মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে,—একদা জনৈক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হিজরত এবং জিহাদের অঙ্গীকারে আপনার হাতে বায়আত হচ্ছি।' আল্লাহ্‌র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছেন? লোকটি বললো, তারা উভয়ই জীবিত আছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'তুমি যদি আল্লাহ্‌র কাছে আজ্‌র ও ছওয়াব পেতে চাও, তা'হলে তুমি তোমার পিতা-মাতার খেদমতে ফিরে যাও এবং তাদের কাছে উপস্থিত থেকে সদ্ব্যবহার কর।'

একদা এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে তীব্র বাসনা থাকা সত্ত্বেও আমি জিহাদ করতে অক্ষম, সেই শক্তি ও সামর্থ আমার নাই।' আল্লাহ্‌র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছেন?

লোকটি বললো, আমার মা জীবিত আছেন। হুযূর বললেন ঃ 'যাও, তুমি তোমার মা'র খেদমতে নিয়োজিত থাক ; তা'হলে তুমি উমরাহ্ এবং জিহাদের সওয়াব পাবে।' (আবূ ইয়া'লা, তাব্‌রানী)

তাব্‌রানী কিতাবে আরও বর্ণিত হয়েছে,—এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদ করবো। আল্লাহ্‌র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তোমার মা কি জীবিত আছেন?' লোকটি বললো, হাঁ, জীবিত আছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

اِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ ـ

'তুমি তোমার মায়ের পদতলে পড়ে থাক, এখানেই তোমার জান্নাত।'

ইব্‌নে মাজাহ শরীফের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে,—'এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি কি হক রয়েছে?' আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ـ

'তাঁরাই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।'

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি এসে জানালো যে, আমার পিতা আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার হুকুম করেছেন, এমতাবস্থায় আমার কি করণীয়। হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বললেন,—'আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ

اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلٰى ذٰلِكَ اِنْ شِئْتَ اَوْ دَعْ

'পিতা হচ্ছেন জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা, ইচ্ছা হয় তুমি সেই দরজার হেফাযত কর, অথবা স্বেচ্ছায় তুমি তা' ধ্বংস কর।' (তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আমার এক স্ত্রীর সাথে খুবই ভালবাসা ছিল ; কিন্তু আমার পিতা হযরত উমর (রাযিঃ)

তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। একদা হযরত উমর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমি অস্বীকার করলাম। অতঃপর তিনি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার হুকুম করলেন।' (ইব্‌নে হাব্বান, তিরমিযী)

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,—হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُمَدَّ لَهٗ فِىْ عُمُرِهٖ وَيُزَادَ فِىْ رِزْقِهٖ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ.

'যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনের দীর্ঘায়ু ও সচ্ছল জীবিকা কামনা করে, সে যেন পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়-স্বজনের হক প্রতিপালন করে।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে,—আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে সন্তান পিতা-মাতার খেদমত করবে, তাকে সুসংবাদ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন।' (মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, হাকেম)

'ইব্‌নে মাজাহ' শরীফে বর্ণিত হয়েছে,— হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ পাপাচার মানুষের রিযিকে অভাব ও দরিদ্রতা আনয়ন করে। তকদীরকে একমাত্র দো'আই ফিরিয়ে রাখতে পারে আর জীবনের দীর্ঘায়ু একমাত্র পিতা-মাতার খেদমতের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে।

বর্ণিত আছে,—'পরপুরুষের স্ত্রী'র প্রতি দৃষ্টি করো না। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র ও সংযমশীল থাক। তা'হলে তোমার স্ত্রী'ও পাকদামান থাকবে। অনুরূপ স্বীয় পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, তা'হলে তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমার কোন ভাই যদি তোমার সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে আসে, তা'হলে সে ন্যায়ভাবে আসুক বা অন্যায়ভাবে অবশ্যই তুমি তাকে অভিনন্দন জানাও এবং তার অভিপ্রায়

গ্রহণ করে নাও। অন্যথায় হাশরের ময়দানে হাউজে কাউসারে তোমার উপস্থিতি নিষিদ্ধ হয়ে থাকবে।'

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার বলতে লাগলেন, 'লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক, নাকে খত লাগুক।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এহেন অপমানকর বদ্‌দো'আ আপনি কার জন্য করলেন? তিনি বললেন, ওই ব্যক্তির জন্য যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা যেকোন একজনকে দুনিয়াতে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়া সত্ত্বেও তাদের খেদমত করে নিজের জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে নিতে পারলো না।

তাব্‌রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর আরোহণপূর্বক বললেন, আমীন, আমীন, আমীন। অতঃপর তিনি নিজেই বললেন, এক্ষণে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) এসে বললেন,—'হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় জীবদ্দশায় রমযান মাস পাওয়া সত্ত্বেও এর বরকত ও ফযীলতের ওসীলায় আপন পাপ মোচন করতে পারলো না ; বরং মৃত্যুর পর তার দোযখেই প্রবেশ করতে হয়, এমন লোকের উপর ধিক, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে সে বহু দূরে পড়ে থাকুক। অতঃপর আমি এই বদ্‌দো'আর সমর্থনে 'আমীন' বলেছি।'

ইব্‌নে হাব্বানের বর্ণনায়,—'হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বদ্‌দো'আ করেছেন, বিতাড়িত হোক ওইসব লোক, যারা স্বীয় পিতা-মাতা উভয়কে বা যেকোন একজনকে পেল ; অথচ তাদের খেদমত করে বেহেশ্‌ত অবশ্যম্ভাবী করে নিতে পারলো না। অতঃপর সমর্থনে আমি বলেছি 'আমীন।'

হাকেম রেওয়ায়াতটি পূর্ণভাবে উল্লেখ করেছেন। তাতে সর্বশেষ অংশটি এভাবে রয়েছে,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বরের তৃতীয় সিঁড়িতে কদম রাখলেন, তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বলেছেন,—যে সন্তান পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করে নিজে জান্নাত লাভ করতে পারলো না, তার প্রতি ধিক্, 'সে বিতাড়িত হোক।' আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন,—'আমীন'।

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,—'যদি কেউ কোন মুসলমান ক্রীতদাসকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়, তা'হলে আল্লাহ্ তাকে দোযখের

অগ্নি থেকে মুক্তি দান করবেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতাকে পেয়েও তাদের খেদমত করে আল্লাহ্র নিকট হতে ক্ষমা হাসিল করতে পারলো না, তার উপর ধিক্, রহমত হতে সে বহু দূরে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সেবা ও সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা অধিক হকদার কে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার মা।' লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, তারপর কে? হুযুর বললেন ঃ 'তোমার মা।' লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেও হুযুর বললেন ঃ 'তোমার মা।' লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'অতঃপর তোমার পিতা তোমার সেবা ও সদ্ব্যবহারের হকদার।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু বকর তনয়া হযরত আসমা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,—একদা আমার মা আমার নিকট আসলেন। হুযুরের যুগে তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম,—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা মুসলমান নন ; এমতাবস্থায় কি আমি তাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করবো? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'অবশ্যই তুমি তোমার মা'র খেদমত করবে এবং তাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।'

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

رِضَا الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ -

'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে। অনুরূপ পিতা-মাতাকে যদি অসন্তুষ্ট করা হয়, তা'হলে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। (ইব্নে হাব্বান ও হাকেম)

হাদীস শরীফে আছে, এক ব্যক্তি আরজ করেছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অনেক বড় পাপ করে ফেলেছি, আমার জন্য কি তওবা'র কোন সুযোগ আছে? হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমার মা কি জীবিত আছেন?'

সে বললো, 'জ্বী না।' হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার খালা কি জীবিত আছেন? সে বললো, 'জ্বী হাঁ।' হুযুর বললেন ঃ 'তুমি তোমার খালার খেদমত কর এবং তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর।' (তিরমিযী, ইব্নে হাব্বান, হাকেম)

এক ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর তাঁদের জন্য আমার কি হক পালন করতে হবে? তিনি উত্তর করলেন ঃ 'তাদের পাপ-মুক্তির জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে দো'আ কর, তাঁদের সাথে তোমার কৃত প্রতিশ্রুতি এবং তাঁদের কৃত ওসিয়ৎ পালন কর। তাঁদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মান কর এবং তাঁদের আত্মীয় ও প্রিয়জনের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।' (আবু দাউদ ও ইব্নে মাজাহ্)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমর (রাযিঃ)-এর সাথে মক্কার এক জায়গায় জনৈক মরুচারী বেদুঈন লোকের সাক্ষাৎ হয়। তাকে দেখে তিনি সালাম নিবেদন করলেন, স্বীয় উষ্ট্রীর উপর তাকে আরোহণ করালেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে নিজের মাথার পাগড়িখানা উপহার দিলেন। সফরসঙ্গী হযরত ইব্নে দীনার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এরা বেদুঈন লোক, সামান্য সম্মানেই এরা তুষ্ট, আপনি এতো অধিক সম্মান প্রদর্শন করলেন এর কারণ কি? হযরত ইব্নে উমর বললেন ঃ 'এই বেদুঈনের পিতা আমার পিতার (হযরত উমরের) দোস্ত ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,—পিতার প্রতি সন্তানের সবচেয়ে বড় হক ও কর্তব্য হচ্ছে, সন্তান পিতার বন্ধু-বান্ধব ও তাদের আত্মীয়-প্রিয়জনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।' (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু বুরদাহ্ (রাযিঃ) বলেন,—একদা আমি মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলে হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমর আমার নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন,—'আপনি জানেন? আমি আপনার নিকট কেন উপস্থিত হয়েছি? অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'আমি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পরেও তার সাথে সদ্ব্যবহার করতে চায়, সে যেন পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করে। সেমতে আমার পিতার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল, আমি চাই আপনার প্রতি আমার সেই

হক পালন করতে।' (ইব্‌নে হাব্বান)।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীসখানি বর্ণিত হয়েছে ঃ পূর্বকালের তিনজন লোক কোথাও চলার পথে বৃষ্টি এসে তাদেরকে এক পর্বতগুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। তারা সেই গুহায় প্রবেশ করার পর একটি বৃহৎ পাথর খসে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। অতঃপর তারা পরস্পর বলতে লাগলো—তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের খাঁটি আমলকে ওসীলা বানিয়ে দো'আ করলে এই পাথরের বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। তাদের একজন বললো ঃ 'হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ, আমি তাঁদেরকে আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির পূর্বেই দুধ পান করিয়ে দিতাম। একদিন কাঠের সন্ধানে আমাকে বহু দূর যেতে হয়েছিল। যথাসময়ে বাড়ী ফিরে আসতে না পারায় তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহন করে এসে দেখি তাঁরা ঘুমিয়েই রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা আমি পছন্দ করি নাই। আবার তাঁদের পূর্বে পরিবারবর্গকে দুধ খাওয়াতেও ভাল লাগে নাই। কাজেই আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে অপেক্ষমান রইলাম। এদিকে আমার সন্তান-সন্ততি ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার পায়ের কাছে কান্নাকাটি করছিল। এ অবস্থায় ভোর হয়ে গেল এবং তাঁরা জেগে উঠে দুধ খেয়ে নিলেন। হে আল্লাহ্! যদি আমি এ কাজটি একমাত্র তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করে থাকি, তা'হলে এই পাথরের দরুন আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা' দূর করে দাও। এতে পাথরটি কিছুটা সরে গেল ; কিন্তু এর ফাঁক দিয়ে তারা বের হতে পারলো না।

অন্য একজন বললো ঃ হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাত বোন ছিল, তাকে আমি খুব বেশী ভালবাসতাম। একদা আমি তার সঙ্গে মিলনের আকাংখা প্রকাশ করলাম। কিন্তু সে রাজী হলো না। অতঃপর এক দুর্ভিক্ষের সময় সে আমার নিকট এলে আমি তাকে নির্জনে মিলনের শর্তে একশত বিশটি স্বর্ণ-মুদ্রা দিলাম। এতে সে রাজী হয়ে গেল। আমি যখন তাকে পেলাম এবং তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখন সে বললো ঃ 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং অবৈধভাবে আমার কৌমার্য নষ্ট করো না।' এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ আমি তাকে ছেড়ে চলে গেলাম। হে আল্লাহ্! আমি যদি এ কাজ

একমাত্র তোমারই সন্তোষ লাভের উদ্দেশে করে থাকি, তা'হলে আমাদের এই বিপদ দূর করে দাও। এতে পাথরটি আরও কিছুটা সরে গেল ; কিন্তু এই ফাঁক দিয়েও তারা বের হতে পারলো না।

তৃতীয় ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্! আমি কয়েকজন শ্রমিক রেখেছিলাম, তাদের সবাইকে পারিশ্রমিক দিয়েছি ; কিন্তু একজন তার প্রাপ্য হক ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি তার সেই হক ব্যবসায় খাটিয়েছি। তাতে ধন-দওলত অনেক বেড়ে গেছে। কিছুকাল পর সেই ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার হক দাও। আমি বললাম ঃ যত উট, গরু, ছাগল, গোলাম দেখছো সবই তোমার হক। সে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা তুমি আমার সাথে উপহাস করো না। আমি তাকে বললাম ঃ আমি উপহাস করছি না। তারপর সে সবকিছু নিয়ে চলে গেল এবং কিছু রেখে গেল না। হে আল্লাহ্! আমি যদি তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তা'হলে আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। তারপর পাথরটি সরে গেল এবং তারা সকলেই বের হয়ে আসলো।

অধ্যায় ঃ ২৫

যাকাত ও কৃপণতা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে 'এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে' তারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করেছে, সে সমস্ত ধন-সম্পদকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।' (আলি-ইমরান ঃ ১৮০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

'মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না।' (হা-মীম সিজদাহ ঃ ৭)

যারা যাকাত আদায় করে না, তাদেরকে উক্ত আয়াতে মুশরিক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ لَا يُؤَدِّيْ زَكَاةَ مَالِهِ اِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ حَتّٰى يُطَوَّقَ بِهِ عُنُقُهُ

'যে ব্যক্তি স্বীয় ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করবে না, ক্বিয়ামতের দিন তার এসব পুঞ্জীভূত সম্পদ বিষাক্ত অদ্ভুত এক টেকো সাপের আকার

ধারণ করবে এবং তার গলা পেঁচিয়ে ধরে তাকে দংশন করতে থাকবে।'

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'হে মুহাজিরগণ! পাঁচ প্রকারের দোষ ও অসৎ স্বভাব হতে আমি সর্বদা তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি।

এক,—যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে যায়, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার গযব নাযিল হয় এবং তারা এমন এমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যা ইতিপূর্বে তাদের পূর্ব পুরুষরা কখনও দেখে নাই।

দুই,—কাজ-কারবারে মাপ ও ওজনে কম করা। যে জাতি এহেন গর্হিত কাজে অভ্যস্থ থাকবে, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য, অভাব-অনটন মারাত্মক আকার ধারণ করবে। জালেম বাদশাহ তাদের শাসনকর্তা হবে এবং প্রতিনিয়ত প্রজার উপর তার জুলুম-অত্যাচার চলতে থাকবে।

তিন,—যাকাত প্রদান না করা। আল্লাহ্ তা'আলা এহেন জাতিকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে দেন। দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তু না থাকলে অনাবৃষ্টিতে তাদের মারাত্মক দশা হতো।

চার,—আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুকে প্রবল ও জয়ী করে দেন ; তাদের ধন-সম্পদ শত্রুরা যবর দখল করে নেয়।

পাঁচ,—আল্লাহ্‌র আইন পরিত্যাগ করা। যে জাতি আল্লাহ্‌র আইন পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কখনও দূর হয় না ; তারা সর্বদা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কৃপণ ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন এবং দানশীল ব্যক্তিকে ভালবাসেন।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে দু'টি অভ্যাস একত্রিত হতে পারে না ঃ কৃপণতা ও অসৎ স্বভাব।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'কৃপণ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে

না!'

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ 'তোমরা কৃপণতার অভ্যাস পরিত্যাগ কর। কেননা এটা এমন এক অভিশাপ যে, এরই কারণে মানুষ যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, এমনকি খুন-খারাবী পর্যন্ত হয়।'

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'ধন-সম্পদে কৃপণতা করা অতিশয় নীচতা ও সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ।

হযরত হাসান (রাযিঃ)-কে কৃপণতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'কৃপণতা হচ্ছে, মানুষের এ কথা চিন্তা করা যে, আমি ব্যয় করলাম তো ধ্বংস হয়ে গেল, আর জমা করে রাখলাম তো এটাই আমার বড় কাজ হলো।'

বস্তুতঃ কৃপণতার উৎসমূল হচ্ছে, ধনলিপ্সা, দুর্লোভ-দুরাশা, দারিদ্র্যের আশংকা, সন্তানের মোহ-মায়া। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'সন্তান-বাৎসল্য মানুষকে অনেক সময় কৃপণ ও কাপুরুষ বানিয়ে দেয়।'

অনেক সময় এমনও লোক দেখা যায় যে, তারা যাকাত প্রদান করতে অসম্মত, কেবল টাকা-পয়সার প্রতি দৃষ্টি করে চোখ জুড়ায়, অর্থ-কড়ি গণনা করে তৃপ্তি লাভ করে, হাতের মুঠোতে রেখে স্বাদ গ্রহণ করে অথচ সে খুব ভাল করেই জানে যে, একদিন মরতে হবে, মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

হযরত বিশ্‌র (রহঃ) বলেছেন ঃ 'বখীলের (কৃপণ) সাথে দেখা-সাক্ষাত করাও আপদের কারণ হয়। কেননা তার দিকে তাকালে হৃদয় পাষাণ হয়ে যায়।'

তদানীন্তন কালেও আরবের লোকেরা কৃপণতা ও কাপুরুষতাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও দোষণীয় মনে করতো। যেমন এ বিষয়ের উপর জনৈক কবির বিবৃতি হচ্ছে ঃ 'তোমরা কাজে-কর্মে নিশ্চিন্তে ব্যয় করতে থাক, দারিদ্র্যকে মোটেও ভয় করো না। কেননা, রিযিক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পূর্বেই নির্ধারিত পরিমাণে বন্টিত হয়ে গেছে।'

বখীল (কৃপণ) ব্যক্তির অপমান ও হেয় প্রতিপন্নতার জন্য এ শাস্তিই

যথেষ্ট যে, ১. ধন-সম্পদ সে অপরের জন্য জমা করে ; নিজের জন্য ব্যয় করাটা তার ভাগ্যে জুটেনা। ২. অথচ এ সম্পদের জের হিসাবে আবর্তিত যাবতীয় কায়-ক্লেশ ও প্রায়শ্চিত্ত সব তারই পোহাতে হয়। ৩. সঞ্চিত সম্পদের আস্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকে। ৪. কোনরূপ আনন্দ ও পুলক অনুভব করেনা ; সর্বদা বিষন্নমন হয়ে থাকে। ৫. মালের কল্যাণ থেকে মাহ্‌রূম থাকে।

'আল-হেকামুল মানসূরা' গ্রন্থে আছে,—'বখীলকে একথা চূড়ান্তভাবে শুনিয়ে দাও যে, তার কুক্ষিগত ধন-সম্পদ হয় ধ্বংস হয়ে যাবে নতুবা তৎসমুদয় উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর হবে। নিজে উপভোগ করা কোনক্রমেই তার ভাগ্যে জুটবে না।'

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন ঃ 'বখীল ব্যক্তি কখনও ন্যায়-নিষ্ঠ ও আমানতদার হয় না। অতএব তার ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করা আমি সমীচীন মনে করি না। কেননা মজ্জাগত খেয়ানতের ফলশ্রুতিতে নিজের অভাব ও স্বল্পতার ভয়ে সে অন্যের মাল অধিক পরিমাণে দখল করে থাকে।'

হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস্ সালাম একদা ইবলীসকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'ওহে ইবলীস! আচ্ছা, বল দেখি মানুষের মধ্যে কে তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় আর কে সবচেয়ে বেশী অপছন্দ?' সে বলেছে,—'আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় হচ্ছে, যে ব্যক্তি মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও বখীল, আর সবচেয়ে বেশী অপছন্দ হচ্ছে, যে ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও ছখী (মহৎ ও দানশীল)।' হযরত ইয়াহ্‌য়া জিজ্ঞাসা করলেন, এর কারণ কি? ইবলীস বললো,—বখীল ব্যক্তির বুখ্‌ল বা কৃপণতা এমন একটি দোষ যে, সে মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও আমি তার মন্দ পরিণামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকি। কিন্তু ছাখাওয়াত বা মহত্ত্ব ও দানশীলতা এমন এক গুণ যে, আমার সর্বদা আশংকা হয় ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর ইবলীস বিদায় নেওয়ার সময় বলে গেলো,—'আপনি যদি আল্লাহ্‌র নবী ইয়াহ্‌য়া না হতেন, তবে আমি একথা কিছুতেই বলতাম না।'

অধ্যায় ঃ ২৬

দুর্লোভ, দুরাশা ও উচ্চাভিলাষ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَانِ طُوْلُ الْأَمَلِ وَاتِّبَاعُ الْهَوٰى
وَإِنَّ طُوْلَ الْأَمَلِ يُنْسِى الْآخِرَةَ وَاتِّبَاعَ الْهَوٰى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ۔

'তোমাদের ব্যাপারে যে দু'টি ক্ষতিকর বিষয়ের আমি সর্বাধিক আশংকা বোধ করি তা' হচ্ছে,—এক, দুর্লোভ ও দুরাশা। দুই, প্রবৃত্তির খাহেশ ও কামনা-বাসনার অনুসরণ।' বস্তুতঃ দীর্ঘ আশার পরিণামে মানুষ আখেরাতকে ভুলে যায় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে হক ও সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করে দেয়।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমাদেরকে আমি এরূপ তিনটি বিষয়ের কথা বলছি, যারা এগুলোতে লিপ্ত হবে, তারা তিন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে,—এক, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও মোহগ্রস্ত ব্যক্তি এমন অভাব ও দারিদ্র্যে পতিত হবে, যা কোনদিন দূর হওয়ার নয়। দুই, দুনিয়ার প্রতি লোভী ব্যক্তি সর্বদা এমন ব্যস্ততায় থাকবে, যা কোনদিন শেষ হওয়ার নয়। তিন, ধন-দৌলতের ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি এমন বিষন্ন ও চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, যা কোনদিন দূর হওয়ার নয়।'

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) হিম্‌স্‌বাসীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন,- 'তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত, এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করছো, যেগুলোতে তোমরা চিরকাল বসবাস করতে পারবে না। তোমরা অন্তরে দুর্লোভ ও দীর্ঘ আশা পোষণ করেছো, যেগুলো কোনদিন পূরণ হওয়ার নয়। তোমরা প্রচুর ধন-ঐশ্বর্য কুক্ষিগত করেছো, যেগুলো কোনদিন খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তোমাদের পূর্বপুরুষরা তোমাদের

অপেক্ষা অনেক বেশী মজবুত ও পাকা-পোক্ত অট্টালিকা প্রস্তুত করেছে, অনেক বেশী সম্পদ জমা করেছে এবং তোমাদের তুলনায় অধিক দীর্ঘ আশা পোষণ করেছে ; কিন্তু কোথায়, আজকে তাদের কোন অস্তিত্ব আছে? সবই তাদের ধ্বংস হয়ে গেছে, লয় ও বিলুপ্তির অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।'

হযরত আলী (রাযিঃ) হযরত উমর (রাযিঃ)-কে বলেছিলেন ঃ 'আপনি যদি আপনার দুই পূর্বসূরীর পদাংকানুসরণ করতে চান, তা' হলে আপনার পরিধেয় পোশাক তালি লাগান, নিজের পাদুকা নিজেই মেরামত করুন। দীর্ঘ আশা পরিহার করুন, পরিতৃপ্ত হওয়ার পূর্বেই পানাহার শেষ করুন।

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় পুত্র হযরত শীস্ (আঃ)-কে পাঁচটি বিষয়ের ওসীয়ৎ করেছেন এবং পরবর্তীতে নিজের সন্তানদিগকেও এ ওসীয়ৎসমূহ প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

এক,—পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ো না ; চিরস্থায়ী জান্নাতের নায-নে'আমতের উপর নির্ভরশীল হয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, পরিণামে আমাকে সেখান থেকে বের হতে হয়েছে।

দুই,—স্ত্রীলোকের খাহেশ ও আরজুর অনুসরণ করো না ; আমি আমার স্ত্রী'র কথায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিলাম। পরিণামে আমাকে চরম লজ্জিত হতে হয়েছে।

তিন,—যে কোন কাজ করতে মনস্থ কর, সর্বপ্রথম সেই কাজের শেষ পরিণাম কি হবে, সে বিষয়ে চিন্তা করে নাও ; কেবল এতটুকু বিষয় চিন্তা না করার কারণে আমাকে বহু দুঃখ পোহাতে হয়েছে।

চার,—যে কোন কাজ করতে যদি তোমার মনে দ্বিধা বোধ হয়, তা' হলে সেই কাজ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর ; নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি ধাবিত হওয়ার পর আমার দ্বিধা অনুভূত হয়েছিল ; তবুও ভক্ষণকার্য ত্যাগ না করার পরিণামে আমাকে লজ্জিত হতে হয়েছে।

পাঁচ,—প্রতিটি কাজে পরামর্শ গ্রহণ কর ; আমিও যদি ফেরেশ্‌তাদের সাথে পরামর্শ করে নিতাম, তা' হলে আমাকে এ দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন,—হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ)বলেছেন ঃ সকালে ঘুম থেকে উঠে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচার আশা করো না, আবার সন্ধ্যায়ও পরবর্তী সকাল পর্যন্ত বাঁচার আশা করো না ; প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক, আর জীবনের নিঃশ্বাস যে পর্যন্ত আছে, প্রতিটি মুহূর্তকে সুযোগ মনে করে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। অনুরূপ পীড়াগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থ দেহে কিছু করে নাও ; কেননা তুমি নিশ্চয় করে জাননা যে, পরবর্তী মুহূর্তটিতে তুমি বেঁচে থাকবে।

একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তোমরা সকলেই কি জান্নাত লাভ করতে চাও?' তাঁরা বললেন ঃ 'অবশ্যই, ইয়া রাসুলাল্লাহ্!' তখন আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ 'তা' হলে তোমরা আশা খাট করে নাও এবং হক আদায় করে যথার্থভাবে আল্লাহ্‌কে লজ্জা কর।' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ 'আমরা তো আল্লাহ্‌কে লজ্জা করি।' হুযুর বললেন ঃ

لَيْسَ ذٰلِكَ بِالْحَيَاءِ وَلٰكِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ تَذْكُرُوا الْمَقَابِرَ وَالْبِلٰى وَتَحْفَظُوا الْجَوْفَ وَمَا وَعٰى وَالرَّاْسَ وَمَا حَوٰى وَمَنْ يَشْتَهِى كَرَامَةَ الْاٰخِرَةِ يَدَعُ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَهُنَالِكَ اسْتِحْيَاءُ الْعَبْدِ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

'কেবল এতটুকুই নয় ; বরং প্রকৃত লজ্জা হচ্ছে, তোমরা সর্বদা কবর ও কবরের অভ্যন্তরের কঠিন পরীক্ষা ও জটিল সমস্যার কথা স্মরণ কর, স্বীয় উদর ও উদরস্থিত এবং মস্তক ও মস্তকস্থিত (যাবতীয় পানীয়, খাদ্য, পরিচ্ছদ, চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা-পরিকল্পনা) সবকিছুর হেফাজত কর। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আখেরাতে শান্তি ও পুরস্কার কামনা করে, সে দুনিয়ার চাকচিক্য ও আকর্ষণে বে-পরওয়া হয়ে তা' পরিত্যাগ করে। মূলতঃ এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌কে লজ্জা করার মর্ম।' এভাবে জীবন গড়েছে যারা, তারাই আল্লাহ্‌র ওলী এবং তাঁর বন্ধুত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'এই উম্মতের সংশোধন ও কল্যাণের সূচনা হয় দুনিয়া ত্যাগ ও আখেরাতের

প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও অনুরাগ থেকে, আর ধ্বংস ও বিনাশের পূর্ণতা ও সমাপ্তি ঘটে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশায় গিয়ে।'

হযরত উম্মে মুন্‌যির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশা'র সময় লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে লজ্জা কর না?' সকলেই জিজ্ঞাসা করলো,—তা' কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হুযুর বললেন ঃ 'তোমরা এতো প্রচুর মাল-সম্পদ জমা করেছো, যেগুলো ভোগ করে শেষ করতে পারবে না, এতো দীর্ঘ আশা পোষণ করছো, যেগুলো পূর্ণ হওয়ার নয় এবং বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করছো যেখানে চিরকাল বাস করতে পারবে না।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা হযরত উসামা (রাযিঃ) একটি দাসী খরিদ করলেন। যার দাম এক মাস পর দেওয়ার কথা ছিল। এ কথা শুনে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ 'উসামা কত দীর্ঘ আশাই না করেছে! ওই সত্তার কসম, যার পবিত্র মুঠোতে আমার প্রাণ, একবার চক্ষু উন্মীলন করার পর পরবর্তী পলকের আশা আমি করতে পারি না ; আশংকা হয় এ-ই বুঝি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত। খাদ্য এক লুকমা মুখে উত্তোলন করার পর চিবানো পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করতে পারি না।' অতঃপর তিনি আরও বললেন ঃ 'তোমাদের যদি অনুভূতি থাকে, তা' হলে তোমরা নিজেদেরকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। কারণ মৃত্যু তোমাদের জন্য অবধারিত নিতান্ত সত্য প্রতিশ্রুতি, যেকোন মুহূর্তে তা' উপস্থিত হতে পারে তখন সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার তোমাদের কোনই ক্ষমতা থাকবে না।'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির উদ্দেশে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু পানি পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই তিনি তায়াম্মুম করে নিলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পানি সন্নিকটেই তো আছে। হুযুর (সঃ) ইরশাদ করলেন ঃ 'জানি না, পানি পর্যন্ত পৌঁছতে মৃত্যু আমাকে অবকাশ দিবে কিনা।'

একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কাঠি হাতে নিয়ে একটি সম্মুখে, দ্বিতীয়টি পার্শ্বে এবং তৃতীয়টি বেশ দূরে মাটিতে গেড়ে উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা জান? এগুলো কি?

সাহাবীগণ উত্তর করলেন,—আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। অতঃপর তিনি সম্মুখস্থ কাঠির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন ঃ 'এটা হচ্ছে মানুষ, আর পার্শ্বেই হচ্ছে তার মৃত্যু, আর ঐ দূর প্রান্তে দেখা যাচ্ছে তার আশা-আকাঙ্খা, যেগুলো অন্তরে বহন করে বেচারা আদমের সন্তান ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে ; কিন্তু তৎপূর্বেই মৃত্যুর বাধা এসে তাকে চিরবঞ্চিত ও অপমানিত করে ফেলে।'

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম লক্ষ্য করলেন, জনৈক বৃদ্ধ কোদাল দিয়ে মাটি কাটছে। তিনি দো'আ করলেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ্! এই বৃদ্ধের দুনিয়ার আশা তুমি রহিত করে দাও।' তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ কোদাল রেখে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর হযরত ঈসা আবার দো'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! তার আশা-আকাংখা আবার ফিরিয়ে দাও।' তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ উঠে পুনরায় কাজ আরম্ভ করে দিল। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, বৃদ্ধ বললো ঃ 'কাজ করতে সময় মনে আমার চিন্তা আসলো, আর কতকাল এ বৃদ্ধ বয়সে আমি পরিশ্রম করে যাবো,—এই ভেবে আমি কোদাল রেখে বসে গেছি। কিছুক্ষণ পর আবার খেয়াল আসলো, যতদিন হায়াত আছে বেঁচে থাকবো ; তখন পুনরায় কোদাল হাতে নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি।'

অধ্যায় ঃ ২৭

সর্বক্ষণ আল্লাহ্র ইবাদত ও দাসত্বমগ্নতা এবং হারাম বিষয়াবলী বর্জন করা

আল্লাহ্র দাসত্ব ও ইবাদতের অর্থ হচ্ছে, বান্দার প্রতি আরোপিত প্রতিটি ফরযকার্য যথাযথভাবে পালন করা, নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়সমূহ পরিহার করা, তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান কায়মনোবাক্যে প্রতিফলিত করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

'এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।' (কাসাস ঃ ৭৭)

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ উক্ত আয়াতের মর্ম হচ্ছে, বান্দা যেন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্র দাসত্ব ও ইবাদতে মগ্ন থাকে।

স্মরণ রেখো,—প্রকৃত ইবাদত হচ্ছে,—আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থ পরিচয় ও মর্যাদার উপলব্ধি হাসিল করা এবং সর্বদা অন্তরে তা' জাগরুক রাখা, সর্বদা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত-শঙ্কিত থাকা, একমাত্র তাঁরই কাছে আশা-আকাংখা প্রকাশ করা, সর্ববিষয়ে আল্লাহ্র মর্জ্জিমত চলা এবং প্রতিনিয়ত নিজের চুলচেরা ও সচেতন হিসাব-নিকাশ নিতে থাকা। বান্দা যদি এরূপ সদ্গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হয়, তা' হলে প্রকৃত প্রস্তাবে সে ঈমানের হাকীকত থেকেই মাহ্রূম। কেননা, আল্লাহ্র যথার্থ পরিচয় ব্যতিরেকে বান্দার ইবাদত-বন্দেগীই শুদ্ধ হবে কি-করে? সুতরাং বান্দার উপর ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে, অনাদি-অনন্ত সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্র মা'রেফাত হাসিল করা, যার জ্ঞানের পরিধির কোন সীমা ও পরিমণ্ডল নাই, তাঁকে ছাড়া আর সবই সসীম। সকল সসীমের অনন্ত ঊর্ধ্বে যার স্থান, যার কোন নযীর বা দৃষ্টান্ত নাই ; তিনিই একমাত্র সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা।

এক বেদুঈন হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে আলী ইব্‌নে হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—ইবাদতের সময় আপনি কি আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রত্যক্ষ থাকেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন ঃ 'অবশ্যই ; যদি না-ই দেখি, তবে তার ইবাদত করি কেন?' বেদুঈন জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি তাঁকে কিভাবে দেখেন?' তিনি বললেন ঃ 'স্থূলদ্রষ্টারা তাঁকে দেখতে সক্ষম নয় ; তাঁকে দেখতে হলে প্রয়োজন অর্ন্তদৃষ্টির ঃ ঈমানের হাকীকত যাদের নসীব হয়েছে, তারাই তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।'

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীকে আধ্যাত্মজ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন ঃ 'এটা একান্ত রহস্যাবৃত খোদায়ী ভেদ, স্বীয় প্রিয়জনদেরই আল্লাহ্ তা'আলা তা' দান করে থাকেন, নিকটতম কোন ফেরেশ্‌তাও তা' জানতে পারে না।'

হযরত কা'ব আহ্‌বার (রাযিঃ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে যদি আদম-সন্তানের এক সরিষার দানা পরিমাণও একীন হাসিল হয়, তবে সে পানির উপর দিয়ে পদব্রজে চলতে আরম্ভ করবে।' বস্তুতঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার পরম করুণা যে, তিনি তাঁর 'পরিচয়লাভে অপরাগতার স্বীকৃতি'কেও 'ঈমান' বলে গণ্য করেছেন, যেমন আল্লাহ্‌র 'যথার্থ শোকর আদায় করতে অক্ষমতা' প্রকাশ করাকে 'শোকর' হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। মাহ্‌মুদ ওয়ার্‌রাক বলেছেন ঃ 'বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নে'আমতের শোকর আদায় করা'ও আমার প্রতি তাঁর এহ্‌সান ও স্বতন্ত্র আরেকটি নে'আমত, সুতরাং একবার শোকর আদায়ের পর পুনরায় শোকর আদায় করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। অতএব দুনিয়াতে যত দীর্ঘকালই বেঁচে থাকি না কেন, তাঁর শোকর আদায় করে শেষ করা যাবে না।'

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যত ও একচ্ছত্র প্রভূত্বের জ্ঞান যার হাসিল হয়েছে, তার অবশ্যই স্বীয় উবুদিয়্যত ও দাসত্বের স্বীকৃতি প্রতিফলিত হবে। সুতরাং উক্ত জ্ঞান ও স্বীকৃতির অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বান্দার অন্তরে ঈমান পরিপক্ক হবে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতি মুহূর্তে আমল ও ইবাদত সুদৃঢ়তর হবে। অনন্তর ঈমান দুই প্রকারে বিভক্ত ঃ বাহ্যিক ও আন্তরিক। শুধু মুখে স্বীকার করার নাম বাহ্যিক ঈমান। আর আন্তরিক ঈমান হচ্ছে, মনেপ্রাণে সর্বতোভাবে একীন করা। আর এই ঈমানের ব্যাপারে ঈমানদারদের মধ্যে

পদমর্যাদায় তারতম্যও থাকে অবশ্য। ফলে, ইবাদত-বন্দেগীতেও পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য পরিস্ফুটিত হয় ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও সকলের জন্য 'ঈমান' শব্দটি প্রযোজ্য। অবশ্য নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের স্বল্পতা ও আধিক্যের অনুপাতে ঈমানের মধ্যেও পার্থক্য ও তারতম্য ঘটে থাকে ঃ

এক,—ইখ্‌লাস। ইখ্‌লাসের সারকথা হচ্ছে, স্বীয় আমল ও ইবাদতের প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে দাবী না করা ; কেননা তোমাকে এই ইবাদতের তাওফীকটুকুও তিনিই দিয়েছেন, তিনিই তোমার আমলকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং এতে তোমার কোনই কৃতিত্ব নাই। অতএব যদি সওয়াবের লোভও শাস্তির ভয়ে ইবাদত কর, তা' হলে এটা হবে নিছক ইখ্‌লাস-পরিপন্থী কাজ। কারণ তখন তুমি নিজের স্বার্থে ইবাদত করলে ; আল্লাহ্‌র জন্যে নয়।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ সেই কুকুরের মত হয়ো না, যাকে ভয় দেখিয়ে কাজ নিতে হয়, অনুরূপ সেই মজদুরের ন্যায়ও হয়ো না সে পরিশ্রমিক না পেলে কর্ম ত্যাগ করে।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত।' (হজ্ব ঃ ১১)

বরং বান্দার উপর আল্লাহ্‌র ইবাদত ও দাসত্ব পূর্বাহ্নেই ফরয ও অপরিহার্য হয়েছে, কারণ তিনি পূর্বেই আমাদের প্রতি অসংখ্য অগণিত এহ্‌সান ও কৃপা করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি আমাদেরকে ইবাদতের হুকুম করেছেন

অধিকতর পুরস্কার ও সওয়াব প্রদানের জন্য। এরপরেও যারা অবাধ্যতা করে পাপাচারে লিপ্ত হলো, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়সঙ্গতভাবে শাস্তির বিধান করবেন—এটা তাঁর আদ্ল ও ইনসাফ।

দুই,—তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সারমর্ম হচ্ছে—নিজের প্রতিটি প্রয়োজনে এবং মুসীবতে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে, অতঃপর কোনরূপ হতাশ না হয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। এজন্যেই তাওয়াক্কুলকারীগণ উত্তমরূপে বিশ্বাস করেন যে, দুঃখ-মুসীবত ও প্রয়োজনের দাবী প্রভৃতি তকদীরের নির্ধারিত বিধানেরই ফলশ্রুতি এবং সকল আসবাব ও উপকরণও তাঁরই ক্ষমতাধীন। তাই আল্লাহ্র উপর ভরসাকারীগণ কখনও আল্লাহ্ থেকে বিমুখ হয়ে গায়রুল্লাহ্র শরণাপন্ন হন না।

তিন,—রেজা। 'রেজা'র অর্থ হচ্ছে,—সর্বাবস্থায় তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'যারা তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকে তারাই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়।' আরেক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'অনেক আনন্দের বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো মূলতঃ দুঃখ, আবার অনেক দুঃখের বিষয় এমন রয়েছে যেগুলো মূলতঃ আনন্দ।'

বস্তুতঃ উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার এ ফরমানই যথেষ্ট ঃ

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ

'তোমাদের কাছে যা ভারী মনে হয়, তাই তোমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে।' (বাক্বারা ঃ ২১৬)

স্মরণ রেখো,—আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত পরিপূর্ণভাবে করতে হলে দুনিয়ার মায়া-মোহ পরিপূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'সর্বাপেক্ষা সারগর্ভ নসীহত হচ্ছে, আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তোমার অন্তরে যেন কোনরূপ শৈথিল্য ও অন্তরায় সৃষ্টি না হয়। এসব কলুষ ও অন্তরায় দুনিয়ার মায়া-মোহ থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে ; অথচ দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়বস্তু মুহূর্তকালের জন্য লীলা-খেলা মাত্র। সুতরাং এই অত্যাল্প সময়টুকু তুমি ইবাদতে নিয়োজিত করতে পারলেই আখেরাতের জীবনে অনন্ত সাফল্য লাভ করে চিরধন্য হতে পারবে।'

জনৈক সাহাবী আরজ করেছিলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট

মৃত্যু পছন্দনীয় নয় ; এর কারণ কি?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমার কাছে কি মাল-দৌলত আছে?' বললেন, হ্যাঁ। হুযূর ইরশাদ করলেন ঃ

قَدِّمْ مَالَكَ فَإِنَّ الْمَرْءَ عِنْدَ مَالِهِ ـ

'প্রথমে তুমি নিজের মাল-দৌলতকে পাঠিয়ে দাও ; কেননা মানুষের অন্তর মালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং মাল আগে পাঠিয়ে দিলে পরে নিজেরও যেতে ইচ্ছা হবে।'

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বলেছেন ঃ 'নেকী হাসিল করার তিনটি উপকরণ রয়েছে,—কথা, দৃষ্টি ও নীরবতা। কথা হওয়া চাই আল্লাহ্র যিকর ও স্মরণের সাথে ; তা' না-হলে সেটা হবে অর্থহীন প্রলাপ। দৃষ্টি হওয়া চাই শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ; তা' না-হলে সেটা হবে ভ্রষ্টতা। নীরবতা হওয়া চাই আখেরাতের ফিকিরের সাথে ; তা' না-হলে সেটা হবে নিরর্থক ক্রীড়া-কৌতুক।'

দুনিয়ার মায়া-মোহ ত্যাগ করার পন্থা হচ্ছে, অন্তরে কখনও জাগতিক বিষয়বস্তুর চিন্তা-কল্পনা আনয়ন করবে না এবং এগুলোকে হৃদয়ে কোনরূপ স্থান দিবে না। কেননা চিন্তা-ফিকিরের সাথে মানব-প্রবৃত্তির গভীর সম্পর্ক আছে বিধায় অন্তরে এর মাধ্যমে পার্থিব লোভ-লালসার অনুপ্রবেশ ঘটে।

অনুরূপ দৃষ্টিকে সংরক্ষণ করতে হলে অবৈধ দৃশ্যের প্রতি তাকাবে না। কেননা এহেন অবৈধ দৃষ্টির দ্বারা মানবাত্মা নিশ্চিতভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'কুদৃষ্টি শয়তানের অব্যর্থ তীরসমূহের একটি ; যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে নিজকে কুদৃষ্টি হতে বিরত রাখবে, তার উন্নততর ঈমান নসীব হবে, যার স্বর্গীয় আস্বাদ অন্তরে অন্তরে অনুভব করবে।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টিকে সংযত না করে স্বাধীন-বেয়াড়া ছেড়ে দিয়েছে, সে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধীভূত হয়, পরন্তু লোকজনের সম্মুখে অপমানিত হয় এবং দোযখে তার অবস্থান দীর্ঘতর হয়।'

আফ্লাতুনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মানবাত্মার জন্য মানুষের কোন

অঙ্গটি অধিক ক্ষতিকর? বলেছিলেন ঃ কর্ণ অথবা চক্ষু। এ দুটি আত্মার জন্য দুই ডানাস্বরূপ। পাখীর ন্যায় সে উক্ত ডানাদ্বয়ের সাহায্যে স্বাভাবিক চলাফেরা করে। তন্মধ্যে একটি কেটে গেলে অপরটির সাহায্যে বড় কষ্টে তার চলতে হয়।

মুহাম্মদ ইব্নে যাউ' বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্র সম্মুখে এবং বুদ্ধিমান লোকদের দৃষ্টিতে একজন মানুষ হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, স্বীয় নজরকে সে স্বাধীন ছেড়ে রেখেছে ; সুযোগ পেলেই অবৈধ দৃষ্টিপাত করে।'

জনৈক বুযুর্গ একজন লোককে সুদর্শন একটি বালকের সাথে হাসি-তামাশায় লিপ্ত দেখে বলেছিলেন ঃ 'ওহে! এ হীন কার্যে মত্ত হয়ে তুমি তোমার জীবনকে ধ্বংস করছো ; জ্ঞান-বুদ্ধি, অন্তরের পবিত্রতা ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা বরবাদ করে দিচ্ছো। তোমার নেকী-বদী লিপিবদ্ধকারী এবং তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশ্তাদেরকে কি তুমি মোটেই লজ্জা কর না, ভয় কর না? এসব কার্য তারা লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছে ; তোমার দিকে তারা তাকিয়ে দেখছে, এই হীন অবস্থায় তুমি লিপ্ত রয়েছো, তারা আল্লাহর দরবারে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হচ্ছে, এটা তোমার প্রকাশ্য খেয়ানত ; এভাবে তুমি নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছো।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন ঃ বস্তুতঃ কুদৃষ্টি হচ্ছে, শয়তানের জাল; এরই সাহায্যে সে সাধককে ফাঁদে আটকিয়ে নেয়। চোখের দৃষ্টির অনুসরণে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও প্রতারিত হয়। সুতরাং দৃষ্টির হেফাযত প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযতের নামান্তর। এভাবে সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাযত করে সাধক অনন্ত সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়। অন্যথায় তার সকল আমল-ইবাদত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মুবারক (রহঃ) বলেছেন ঃ প্রকৃত ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত দ্বীনের প্রতি সর্বান্তঃকরণে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। সুতরাং কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী আমল করবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি হারাম দ্রব্যাদি পরিহার করবে, তার তওবা ও খোদা-প্রাপ্তি নসীব হবে। যে হালাল রিযিক গ্রহণ করবে, সে

তাকওয়া ও খোদা-ভীরুতার গুণে ভূষিত হবে। যে ফরযসমূহ পালন করবে, সে প্রকৃত মুসলিম হবে। যার রসনা সংযত হবে, সে যাবতীয় স্খলন থেকে রক্ষা পাবে। যে বান্দার হক আদায় করবে, সে কেসাস-দণ্ড থেকে মুক্ত থাকবে। যে সুন্নতের অনুসরণ করে চলবে, তার সমস্ত আমল পবিত্র ও বরকতময় হবে। আর যার ইখ্লাস ও নিষ্ঠা থাকবে, তার আমল ও ইবাদত আল্লাহ্র দরবারে কবূল হবে।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদা উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'পবিত্র ও হালাল জীবিকা উপার্জন কর, নেক আমল কর, আল্লাহ্র নিকট একদিনের অধিক রিযিক কামনা করো না এবং নিজকে সর্বদা মৃত বলে জ্ঞান কর।'

ঈমানদারের কর্তব্য,—স্বীয় আমলের কারণে আত্মগৌরব ও অহমিকায় লিপ্ত না হওয়া। কারণ, এটা মস্ত বড় আপদ ; সাধকের আমল ও ইবাদতকে ধ্বংস করতে এই আত্মগৌরব ও অহমিকাই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। বস্তুতঃ স্বীয় আমল ও ইবাদতে গৌরবান্বিত হওয়া আল্লাহর প্রতি কৃপা প্রদর্শনেরই নামান্তর ; অথচ স্বীয় কৃত ইবাদতের অবস্থা কি?—গৃহীত না উপেক্ষিত—সাধকের তা' কিছুই জানা নাই। বরঞ্চ ইবাদত করে আত্ম-গরিমায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে সেই পাপ অধিকতর উত্তম, পরিণামে যা তওবা, অনুতাপ ও আত্ম-সমর্পণের কারণ হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ٥

'তারা দেখতে পাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করতো না।' (যুমার ঃ ৪৭)

অর্থাৎ,—দুনিয়াতে তারা যেসব আমলকে খাঁটি ইবাদতরূপে আন্জাম দিয়েছিল, সেগুলোই আখেরাতে তাদের আমলনামায় পাপ হিসাবে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে রিয়াকারী ও আত্মগর্বিত আবেদদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا ٥

'স্বীয় পালনকর্তার ইবাদতে সে যেন কাউকে শরীক না করে।'
(কাহফ ঃ ১১০)

ইবাদতে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, রিয়া করা এবং অহেতুক লজ্জাবশতঃ ইবাদত বর্জন করা অথবা লজ্জাবশতঃ গোপনে ইবাদত করা।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ এ আয়াতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

'ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরাপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।' (বাকারাহ ঃ ২৮১)

হযরত দাঊদ (আঃ) হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামকে নসীহত করেছেন ঃ 'তিনটি বিষয় আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের দৃঢ়তার লক্ষণ ঃএক,—যা পাও নাই, তা' সম্পর্কে আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট চিত্তে তাওয়াক্কুল করবে। দুই,—যা পেয়েছো, সে জন্যে আল্লাহ্র প্রতি রেজা' ও শোকর প্রকাশ করবে। তিন,—যা থেকে বঞ্চিত হয়েছো, তার উপর ছবর করবে।'

'আল-হেকামুল-মানসূরা' কিতাবে আছে,—'মুসীবতের সময় যে ধৈর্যধারণ করে, সে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়।'

ছবরের কয়েকটি শাখা-প্রশাখা রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ঃ এক,—ফরয ইবাদতের উপর ছবর করা, অর্থাৎ,—উত্তম সময় নির্বাচন করে ফরযকার্য সম্পাদন করা। দুই,—নফল ইবাদতসমূহের উপর ছবর করা, অর্থাৎ,—অধ্যবসায়ের সাথে নফল ইবাদত করা। তিন,—প্রিয়জন ও প্রতিবেশীর উৎপীড়নে ছবর করা। চার,—রোগ-শোকে ছবর করা। পাঁচ,—অর্ধাহার, অনাহার ও দারিদ্র্যে ছবর করা। ছয়,—পাপকার্য পরিহার করার ব্যাপারে ছবর করা, অর্থাৎ,—রিপুর তাড়না, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা দমন করা, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাযত করা এবং সর্ববিধ সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করে চলা।

অধ্যায় ঃ ২৮

মৃত্যুর চিন্তা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ .

'তোমরা দুনিয়ার আমোদ-প্রমোদ ধ্বংসকারী মওতের কথা বেশী পরিমাণে স্মরণ কর।' অর্থাৎ,—মওতের কথা চিন্তা করলেই তোমাদের অন্তরে মায়া-মোহ ক্রমশঃ দুর্বল হতে দুর্বলতর হতে থাকবে এবং এভাবে অচিরেই মন থেকে দুনিয়ার মহব্বত বিদূরিত হয়ে আখেরাত ও আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট হবে।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'মানুষ যেমন মওতের কথা অবগত আছে, জীব-জন্তুরাও যদি তেমনভাবে অবগত থাকতো, তবে তোমাদের খাওয়ার উপযুক্ত কোন তাজা জীবই পাওয়া যেতো না ; সকল জীবই মৃত্যুর চিন্তায় দুর্বল-কৃষ হয়ে যেতো।'

একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাশরের দিন শহীদদের সঙ্গে আরও কোন লোক শাহাদতের ফযীলত-প্রাপ্ত হবে কি?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'হাঁ, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রি বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে, সে-ও শহীদের দলভুক্ত হবে।'

মৃত্যুর ধ্যান ও চিন্তার এতো অধিক ফযীলত হওয়ার কারণ হচ্ছে,—এদ্বারা মানুষ পার্থিব জগতের মায়া-মোহ থেকে মুক্ত ও নিবৃত্ত থাকে এবং আখেরাতের জন্য প্রস্তুতিকার্যে সদা নিমগ্ন থাকে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ .

'মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপহারস্বরূপ।'

কেননা দুনিয়া তার জন্য বন্দীখানা ; এখানে দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটাতে হয়, নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে চলতে হয়, প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত করে শয়তানের মুকাবেলা করতে হয়,—অতঃপর মৃত্যুই তাকে এসব দুঃখ-যাতনা হতে রেহাই প্রদান করে।

হাদীস শরীফে আরও উক্ত হয়েছে ঃ

الموت كفارة لكل مسلم -

'মৃত্যু মুসলমানকে পাপ থেকে পাক পবিত্র করে দেয়।'

তবে শর্ত হলো, সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে হবে, আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপে অপর কেউ কষ্ট পেলে হবে না। একজন মুসলমানের সৎগুণাবলী যা হওয়া উচিত, সবই তার মধ্যে থাকতে হবে ; সকল কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে, সকল ফরয দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে হবে, তবেই মৃত্যু এই মুসলমান ব্যক্তির জন্য ছগীরা গুনাহসমূহ থেকে মুক্তির কারণ হবে।

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলতে ও হাসি-ঠাট্টা করতে দেখলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'হাসি-ঠাট্টার অহেতুক আসরকে যে বস্তুটি তিক্ত করে দেয়, তোমরা সেই বস্তুটিকে স্মরণ কর।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তা কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ!' বললেন ঃ 'মৃত্যু'।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اكثروا من ذكر الموت فانه يمحض الذنوب و يزهد في الدنيا -

'তোমরা মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর ; কেননা মৃত্যুর চিন্তা পাপরাশিকে বিলুপ্ত করে দেয়, দুনিয়ার প্রতি অন্তরে ঘৃণা জন্মায়।' হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كفى بالموت واعظا -

'মানুষের উপদেশের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট।'

একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাওয়ার সময় একদল লোককে কথাবার্তা ও হাসি-ঠাট্টা করতে দেখে বললেন ঃ

اذكروا الموت اما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا -

'মৃত্যুকে স্মরণ কর, আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তা'হলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জনৈক ব্যক্তির খুবই প্রশংসা করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'সে ব্যক্তি কি মৃত্যুর চিন্তা করে?' লোকেরা বললো, মৃত্যুর চিন্তা সে করে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তা'হলে সে প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য নয়, যা তোমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করলে।'

হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা আমরা দশজন লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম ; সর্বশেষে উপস্থিত হয়েছি আমি। তখন একজন আনসারী লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সম্মানী ব্যক্তি কে?' বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী, দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানী ও সফলকাম।'

রবী ইব্‌নে খায়সাম (রহঃ) বলেন ঃ 'অদৃশ্য বস্তুসমূহের মধ্যে মৃত্যুর চাইতে উত্তম আর কিছু নাই, যেটির জন্য মু'মিন ব্যক্তি অপেক্ষমান থাকে।' তিনি আরও বলতেন ঃ 'আমার খোঁজ তোমরা কাউকে দিও না; আমি নির্জনতা ভালবাসি ; আমার মঙ্গলের জন্য তোমরা আল্লাহর নিকট দো'আ করো।'

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী স্বীয় ভ্রাতাকে উপদেশ দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ 'মৃত্যুকে ভয় কর, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর, এমন এক জগতে (আখেরাতে) পৌছার পূর্বেই তুমি উক্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নাও, যেখানে তোমাকে চিরকাল

জীবিত থাকতে হবে।’

হযরত ইব্‌নে সীরিন (রহঃ)-এর সম্মুখে মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তিনি শঙ্কিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যেতেন।

হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) প্রতি রাতে মওতের আলোচনার জন্য ফক্বীহ্‌গণের মজলিস অনুষ্ঠান করতেন, তারা যখন মৃত্যু এবং ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কথা আলোচনা করতেন, তখন তিনি তা’ শুনে রীতিমত বিলাপ করে কাঁদতে থাকতেন।

হযরত ইব্‌রাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন ঃ ‘দু’টি বিষয়ের চিন্তা দুনিয়াকে আমার নিকট বিষাদময় করে দিয়েছে। এক,—মৃত্যু, দ্বিতীয়, আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়।’ হযরত কা’ব (রাযিঃ) বলেন ঃ ‘যে ব্যক্তি মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছে, দুনিয়ার মুসীবত ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা তার পক্ষে সহজতর হয়ে গেছে।’

হযরত আশ্‌’আস (রহঃ) বলেন,—হযরত হাসান (রাযিঃ)-এর মজলিসে যখনই আমরা উপস্থিত হতাম, কেবল মৃত্যু, আখেরাত ও দোযখের আলোচনাই শ্রবণ করতাম।

হযরত সাফিয়্যাহ (রাযিঃ) বলেন,—একদা হযরত আয়েশার নিকট জনৈকা মহিলা স্বীয় অন্তরের কাঠিন্যের কথা আরজ করলে তিনি উপদেশ দিয়েছেন ঃ ‘মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, তা’হলে তোমার মন নরম হবে। অতঃপর সেই মহিলা উপদেশ অনুযায়ী মৃত্যুর ধ্যান করলে তার মন বস্তুতই নরম হয়েছে এবং এজন্যে পরবর্তীতে একদিন সেই মহিলা হযরত আয়েশা’র খেদমতে শোকরিয়া জ্ঞাপন করতে এসেছেন।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সম্মুখে মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তাঁর দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার উপক্রম হতো। হযরত দাঊদ (আঃ) মৃত্যুর চিন্তায় অধীর হয়ে এতো বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর শরীরের গ্রন্থিসমূহ পৃথক হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, পুনরায় যখন আল্লাহর রহমত ও দয়ার আলোচনা করা হতো তখন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ ‘বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও মৃত্যু থেকে পলায়ন করে না বা দুঃখিত হয় না।’ হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) জনৈক বুযুর্গের নিকট নসীহত প্রার্থনা করলে তিনি বলেছিলেন ঃ ‘আপনি সর্বপ্রথম খলীফা যিনি নিহত না হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত আপনার সকল পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ মৃত্যু থেকে রেহাই পায় নাই, এখন আপনার পালা এসেছে।’ এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। হযরত রাবী’ ইব্‌নে খায়সাম (রহঃ) স্বীয় বাসগৃহে কবর খনন করে রেখেছিলেন, প্রতিদিন কয়েকবার সেখানে তিনি শয়ন করতেন এবং মৃত্যুকে বারবার স্মরণ করে বলতেন,—‘আমি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও মৃত্যুবিস্মৃত হই, তা’হলে ধ্বংস হয়ে যাবো।’

হযরত মুতার্‌রিফ ইব্‌নে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন ঃ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে বিধায় প্রচুর ধনৈশ্বর্যের অধিকারী লোকেরা মুক্ত মনে স্বীয় সম্পদ উপভোগ করতে পারে না ; সুতরাং এমন নে’আমত (বেহেশ্‌তের চিরশান্তি) কামনা কর যা উপভোগ করতে মৃত্যুর বাধা সৃষ্টি না হয়।’ হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) হযরত আম্বাসাহ্‌কে বলেছেন ঃ ‘মৃত্যুকে অধিকতর স্মরণ কর ; কেননা যদি পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে থাকো, তা’হলে সেটাকে হ্রাস করা উচিত, আর যদি অভাবী হয়ে থাকো, তা’হলে ধৈর্য-সহিষ্ণুতার প্রয়োজন,—এ উভয়ই পয়দা হয় মৃত্যুর চিন্তা থেকে। হযরত আবূ সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) বলেন ঃ ‘আমি উম্মে হারূণকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মৃত্যু কামনা কর? সে বললো,—যেক্ষেত্রে আমি সাধারণ কোন মানুষের অবাধ্যতা করলে তার সম্মুখীন হতে লজ্জাবোধ করি, সেখানে আহকামুল-হাকেমীন আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের অবাধ্য হয়ে কিভাবে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে সাহস করতে পারি?

হযরত আবূ মূসা তামীমী (রহঃ) বলেন ঃ প্রখ্যাত কবি ফারায্‌দাকের স্ত্রী’র জানাযায় বড় বড় মনীষী উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত হাসান বসরীও ছিলেন। তিনি ফারায্‌দাককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—‘পরকালের জন্যে তুমি কি করেছো?’ সে বলেছে,—দীর্ঘ ষাট বৎসর যাবৎ কালেমা তাইয়্যিবা ‘লা’ ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাক্ষ্য দিয়ে আসছি। স্ত্রী’র দাফনকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সে কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেছিলো, সেগুলো বস্তুতই প্রণিধানযোগ্য। পংক্তিগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ ‘আমি কবরের

পরবর্তী ঘাঁটিগুলো সম্পর্কে অধিকতর ভীত-সন্ত্রস্ত, ওগো খোদা! যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন, তবে সেই ভীষণ ও মর্মন্তুদ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার কোন উপায় নাই। হাশরের সেই ভয়াবহ দিনে আমি ফারায্দাকের কি দশা হবে, যেদিন অগ্রে-পশ্চাতে ফেরেশতাগণ তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। সেদিন সেই আদম সন্তানটি কতইনা দুর্ভাগা, যাকে বেড়ী পরিয়ে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

অধ্যায় ঃ ২৯

আকাশমণ্ডলী ও অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি

বর্ণিত আছে,—আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম জওহর বা মূল পদার্থকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই পদার্থের প্রতি তিনি তাঁর অনন্ত কুদরত ও প্রতাপের দৃষ্টি করেন। ফলে তা' বিগলিত হয়ে যায় এবং ভয়ে কাঁপতে থাকে। এভাবে সমগ্র পদার্থ কম্পমান পানিতে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই পানির প্রতি স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের দৃষ্টি করেন। তাতে সমগ্র পানির অর্ধেক পরিমাণ জমাট হয়ে যায়। এই জমাট অংশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরশ সৃষ্টি করেন। তারপর এই আরশও কাঁপতে থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর লিখে দেন কালেমা তাইয়্যিবাহ্ ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

ফলে, আরশ সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু অবশিষ্ট পানির অংশটি কম্পমান অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে, জগতের সমস্ত পানি অদ্যাবধি কম্পমান অবস্থায় রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاۤءِ

'এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।' (হূদ ঃ ৭)

এরপর সেই পানিতে প্রচণ্ড ঊর্মিসংঘাত ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়ে তা' থেকে বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং তা' ক্রমান্বয়ে ভাঁজ ভাঁজ হয়ে ঊর্ধ্বে শূন্যের দিকে আরোহণ করে। বস্তুতঃ তাতে ছিল ফেনার উপকরণ। এ দিয়েই আল্লাহ্ তা'আলা উপরিভাগে সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী এবং নিম্নভাগে পৃথিবী। প্রথমতঃ এ উভয় সৃষ্টি ছিল পরস্পর সংলগ্ন ও অবিচ্ছিন্ন। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর ভিতর বায়ুর সঞ্চার করে আসমান ও যমীনের ভিন্ন ভিন্ন স্তর

সৃষ্টি করলেন এবং সবগুলোকে পৃথক পৃথক অবস্থান দান করলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰىٓ اِلَى السَّمَاۤءِ وَهِىَ دُخَانٌ

'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ।' (হা-মীম সিজ্‌দাহ ঃ ১১)

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে ধূম্রকুঞ্জ থেকে সৃষ্টি করেছেন ; বাষ্প থেকে নয়। এর কারণ হচ্ছে, ধূম্র সৃষ্টিগতভাবে শান্ত এবং এর এক অংশ অপর অংশকে উত্তোলিত করে রাখে। পক্ষান্তরে, বাষ্প সর্বদা বিশৃঙ্খল ও অবিন্যস্ত থাকে। বস্তুতঃ এ সবকিছু আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের অনন্ত মহিমা ও অসীম প্রজ্ঞার অকাট্য দলীল।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পানির প্রতি পুনরায় অনুগ্রহের দৃষ্টি করেন। ফলে, তা শান্ত হয়ে যায়।

পৃথিবী ও নিম্নতম আকাশের মাঝে দুরত্বের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ শত বছরের পথ। অনুরূপ, এক আকাশ থেকে অপর আকাশ পর্যন্ত দুরত্বও তাই। এমনিভাবে, প্রত্যেক আসমানের স্থূলতাও পাঁচ শত বছরের পথ।

কথিত আছে,—নিম্নতম আকাশ তথা পৃথিবীর আসমানের প্রকৃত রং হচ্ছে শুভ্র ; কিন্তু 'ক্বাফ' পর্বতের নীলিমায় (প্রতিবিম্বিত হয়ে) তা' দৃশ্যতঃ নীল বর্ণের দেখায়। এ আসমানের নাম হচ্ছে 'রক্বীয়া'। দ্বিতীয় আসমান হচ্ছে লৌহজাত বস্তুর। এটির নাম ফায়দুম বা মাউন। সর্বদা এ আসমান নূরের জ্যোতির ন্যায় চমকাচ্ছে। তৃতীয় আসমান তামা দ্বারা গঠিত। এর নাম মালাকূত বা হারিয়ূন। চতুর্থ আসমান হচ্ছে অত্যুজ্জ্বল শুভ্র রূপার দ্বারা গঠিত, বিদ্যুতালোকের ন্যায় তা' এমনভাবে চমকাচ্ছে যেন দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিবে। এ আসমানের নাম 'যাহেরাহ্'। পঞ্চম আসমানটি হচ্ছে লাল স্বর্ণের। এর নাম 'মুযাইয়্যানাহ্' বা 'মুসাহ্হারাহ্'। ষষ্ঠ আসমান জওহর তথা মহামূল্য পাথর দ্বারা গঠিত। নূরের জ্যোতিতে অতি উজ্জ্বল এ আসমান। নাম 'খালেসাহ্'। সপ্তম আকাশ হচ্ছে মহামূল্য ইয়াকূত তথা লাল বর্ণের প্রবাল পাথর দিয়ে তৈরী। এর নাম 'লাবিয়াহ্' অথবা 'দামিয়াহ্'। আর এ আসমানেই রয়েছে বাইতুল-মা'মূর, যার কোণ-চতুষ্টয়ের একটি লাল ইয়াকূত রত্নের, দ্বিতীয়টি সবুজ পান্না রত্নের, তৃতীয়টি শুভ্র রূপার এবং চতুর্থটি লাল স্বর্ণের তৈরী। বর্ণিত আছে,—'বাইতুল-মা'মূর মহামূল্য আকীক পাথরে তৈরী। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা এর তওয়াফ করে। একবার তওয়াফ করে যায়, ক্বিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার তাদের আর সুযোগ হয় না।' নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য প্রমাণিত যে, যমীন আসমানের তুলনায় অধিক ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কারণ, আম্বিয়ায়ে কেরামকে এ থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এখানেই তাঁদেরকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। আর যমীনের সকল স্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে, এ পৃথিবী যা সর্বোচ্চ স্তর। কারণ, এ থেকেই সমগ্র জগতবাসী উপকৃত হয়ে থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—আকাশমণ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে, যে আকাশের ছাদ আল্লাহ্‌র আরশের সাথে মিলিত। আর আরশের সংলগ্নতার কারণে এখানেই কুরসীর অবস্থান। অনুরূপ, এ আকাশেই প্রোথিত রয়েছে মানবের কল্যাণার্থে সকল নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ। তবে বড় বড় সাতটি গ্রহ প্রোথিত রয়েছে সপ্ত আকাশে। যথা ঃ সপ্তম আকাশে রয়েছে শনিগ্রহ, ষষ্ঠ আকাশে রয়েছে বৃহস্পতি, এমনিভাবে পঞ্চম আকাশে মঙ্গলগ্রহ, চতুর্থ আকাশে সূর্য, তৃতীয় আকাশে শুক্র, দ্বিতীয় আকাশে বুধ এবং প্রথম আকাশে চন্দ্র।

আল্লাহ্ তা'আলার অনুপম কুদরত ও প্রজ্ঞার নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি সপ্ত আকাশকে ধূম্রকুঞ্জ থেকে সৃষ্টি করেছেন ; অথচ এগুলোর পরস্পরে কোন সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য নাই। অনুরূপ, আকাশ থেকে তিনি বৃষ্টিপাত করে একই পানি দিয়ে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষলতা ও রকমারী ফলমূল সৃষ্টি করেন ; কোনটা সাদা, কোনটা লালচে, কোনটা হলদেটে, আবার কোনটা মিষ্ট, কোনটা টক, কোনটা পানসে ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ

'আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দেই।' (রা'দ ঃ ৪)

এমনিভাবে অঞ্চল ভেদে মানুষের বর্ণ বৈষম্য ; কেউ শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। আবার কেউ উৎফুল্ল, কেউ

চিন্তাগ্রস্ত ; কেউ মু'মিন, কেউ কাফের, কেউ আলেম, কেউ জাহেল ; অথচ সকলেই একই আদমের সন্তান এবং তাঁরই বংশধর। বস্তুতঃ এ হচ্ছে মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত প্রজ্ঞা ও সৃষ্টি নৈপুণ্য।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

(নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়।)

অধ্যায় ঃ ৩০

কুর্সী, আরশ, ফেরেশ্তা রুজি-রোজগার ও তাওয়াক্কুল

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

'তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে।' (বাক্বারাহ্ ঃ ২৫৫)

আয়াতে উল্লেখিত 'কুরসী'-র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত ইল্মকে বোঝানো হয়েছে।' আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'এ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার একক রাজত্ব ও মহাপরাক্রম-শীলতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।' কেউ কেউ 'কুরসী' বলতে সুনির্দিষ্ট একটি আসমানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে এ সম্পর্কে যে তথ্য বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে,—তিনি বলেন ঃ 'কুরসী হচ্ছে মহামূল্য মোতি অর্থাৎ মুক্তার তৈরী ; এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যে কত অধিক তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন।' এক বর্ণনায় প্রকাশ,—'কুরসীর সঙ্গে সাত আসমান ও সাত যমীনের তুলনা হচ্ছে, বিরাট ময়দানে ফেলে দেওয়া একটি আংটির মত।' ইব্নে মাজাহ্ শরীফে আছে,—'আকাশমণ্ডলীর অবস্থান হচ্ছে কুরসীর গর্ভে, আর কুরসীর অবস্থান হচ্ছে আরশের সম্মুখে।'

হযরত ইক্‌রিমাহ্ থেকে বর্ণিত,—'সূর্যের কিরণ কুরসীর নূরের সত্তর ভাগের এক ভাগ। আর আরশ নূরের সত্তর হাজার পরতের একাংশ।' বর্ণিত আছে,—'আরশ বহনকারী ও কুরসী বহনকারী ফেরেশ্তাগণের মধ্যে সত্তর হাজার অন্ধকারের পর্দা এবং সত্তর হাজার নূরের পর্দা রয়েছে।' এগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ পাঁচ শত বছরের পথ। যদি এসব পর্দা না হতো, তা' হলে কুরসী বহনকারী ফেরেশ্তাগণ জ্বলে ছাই হয়ে যেতো। আর আরশ যেহেতু কুরসীর উপরে অবস্থিত জ্যোতিষ্মান পদার্থ, তাই সেটা স্বতন্ত্র

বস্তু। তবে হাসান বসরী (রহঃ) এ ব্যাপারে দ্বিমত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ আরশ মহামূল্য লাল বর্ণের ইয়াকুত তথা প্রবাল পাথরের তৈরী। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ আরশ সাদা মোতির তৈরী। কেউ কেউ সবুজ জওহরের তৈরী বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ নুরের সৃষ্টি বলে মন্তব্য করেছেন। তবে সবচেয়ে নিরাপদ ও চমৎকার অভিমত হচ্ছে,—'এ ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য না করে বিরতি অবলম্বন করাই উচিত।'

জ্যোতির্বিদগণ আরশকে 'নবম আকাশ' বলে অভিহিত করেছেন এবং এই আরশকেই তাঁরা কখনও 'ফালাকে আ'লা' (উচ্চতম আকাশ), কখনও 'ফালাকুল-আফ্‌লাক' (আকাশমণ্ডলীর আকাশ), আবার কখনও 'ফালাকে আত্‌লাস' (গ্রহ-নক্ষত্রশূন্য আকাশ) নাম দিয়ে থাকেন। কেননা, প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের অভিমত অনুযায়ী সমগ্র গ্রহ-নক্ষত্র অষ্টম আকাশে প্রোথিত এবং এই অষ্টম আকাশকে তাঁরা 'ফালাকে বুরূজ' (গ্রহ-নক্ষত্রের আকাশ) নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর শরীয়ত অনুসারীদের দৃষ্টিতে এ (অষ্টম) আকাশই হচ্ছে 'কুরসী' যা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ছাদের অবস্থানে রয়েছে, যার ঘেরাও সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। বান্দার জ্ঞান-গবেষণা এ পর্যন্ত পৌঁছেই শেষ হয়ে যায় ; এরপর কি তা উদঘাটন করার ক্ষমতা বান্দার নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

'এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তবে বলে দাও, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কারও বন্দেগী নাই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।' (তওবা ঃ ১২৮)

উক্ত আয়াতে 'আরশ'-এর জন্য বিশেষণ রূপে 'আজীম' অর্থাৎ, 'মহান' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার কারণ হচ্ছে, আরশ সমগ্র জগতে আল্লাহ্‌র সর্ববৃহৎ সৃষ্টি।

আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত উপরোক্ত তাওয়াক্কুল ও ভরসার সর্বতোভাবে

হক আদায় করেছেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ জন্যেই পবিত্র আসমানী গ্রন্থ তাওরাত প্রভৃতিতে তাঁকে 'মুতাওয়াক্কেল' (আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসাকারী) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা তাওয়াক্কুল হচ্ছে মূলতঃ আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁর যথার্থ পরিচয় প্রাপ্তির অনিবার্য ফলশ্রুতি। আর হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সমস্ত একত্ববাদী ও আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত আরেফীনের মহান সরদার।

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কাজে-কর্মে চেষ্টা-তদবীর করা এবং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা মোটেও তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয় ; বরং এর জন্যে রীতিমত হুকুম করা হয়েছে। একদা জনৈক বেদুঈন লোক হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার উষ্ট্রীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবো, না বাঁধনমুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবো?' তিনি জওয়াবে বললেন ঃ 'সর্বাগ্রে উষ্ট্রীকে দড়ি দিয়ে বাঁধ, তারপর তাওয়াক্কুল কর।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَّتَرُوْحُ بِطَانًا.

'তোমরা যদি সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করতে, তা' হলে পাখীদের তিনি যেভাবে রিযিক পৌঁছিয়ে দেন, তোমাদেরও তেমনি পৌঁছিয়ে দিতেন। পাখীরা সকালে ক্ষুধা নিয়ে বের হয়, সন্ধ্যায় পেটপুরে তৃপ্ত হয়ে ফিরে।' 'পাখীরা বের হয়' এ অংশটুকু দ্বারা হাদীস শরীফে উপায়াদি অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একদা বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত শকীক বলখী (রহঃ)-এর সঙ্গে ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের মক্কা মুকার্‌রামায় সাক্ষাৎ হয়। শকীক বলখীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'বুযুর্গীর এ উচ্চতম পর্যায়ে আপনি কিভাবে উন্নীত হলেন?' তিনি বললেন ঃ 'একদা আমি তরুলতা বিহীন বিজন এক প্রান্তরে একটি পাখী

পড়ে থাকতে দেখি। পাখীটির দু'টি ডানাই ভেঙ্গে অকেজো হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থা দেখে পঙ্গু পাখীটির জীবিকার ব্যবস্থা কি? তা' অবলোকন করার জন্য একটু দূরে বসে সেদিকে লক্ষ্য করতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম, একটি সুস্থ-সক্ষম পাখী ঠোঁটে করে একটি ফড়িং এনে তাকে খাওয়াইয়ে চলে গেল। এ দৃশ্য দেখে আমি চিন্তা করলাম, যে মহান সত্ত্বা এই পঙ্গু পাখীটির জীবিকার জন্য আরেকটি পাখী নিয়োগ করে রেখেছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে যেকোন অবস্থায় রিযিক দান করার ক্ষমতা রাখেন। অতঃপর আমি কাজ-কারবার পরিত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন হয়ে পড়ি।' এ কথা শুনে হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম বললেন,—'হে শকীক! এর চাইতেও উচ্চতর মর্যাদা হলো, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى

'দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'

সুতরাং প্রকৃত মু'মিন সর্বদা চেষ্টা করবে সর্ববিষয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদা হাসিল করতে ; এভাবে সে 'আবরার'-এর মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হবে। হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের মুখে উক্তরূপ বক্তব্য শুনে শকীক (রহঃ) শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ 'হে আবূ ইসহাক! (ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের উপনাম) আজ থেকে আপনি আমার উস্তায ও দীক্ষাদাতা।' বস্তুতঃ কাজে-কর্মে মানুষ যদিও উপায়-উপকরণ অবলম্বন করবে ; কিন্তু এগুলোর প্রতি সে মোটেও দৃষ্টি করবে না ; একমাত্র ভরসা ও নির্ভর করবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর। যেমন ভিক্ষুক হাতে থলি নিয়ে যখন লোকদের নিকট যায়,তখন তার দৃষ্টি কখনও স্বীয় থলির প্রতি থাকে না, বরং সর্বক্ষণ সে দাতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّكُوْنَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللّٰهِ اَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِيْ يَدَيْهِ ـ

'যে ব্যক্তি জীবিকার ব্যাপারে অধিকতর নিশ্চিন্ত হতে চায়, সে যেন

নিজের (কাছে রক্ষিত) সম্পদের চাইতে আল্লাহ্‌র (কাছে রক্ষিত) সম্পদের প্রতি বেশী আশাবাদী ও ভরসাকারী হয়।'

বর্ণিত আছে,—হযরত হুযাইফা মারআসী হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (রহঃ)-এর খাদেম ছিলেন। একদা লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'আপনি দীর্ঘকালব্যাপী হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের সংসর্গে ছিলেন। তাঁর মধ্যে অত্যাশ্চর্যকর কি অলৌকিক বিষয় দেখেছেন, তা বলুন। হযরত হুযাইফা বললেন ঃ 'একবার আমরা উভয়ে মক্কা শরীফ অভিমুখে গমন করছিলাম। পথিমধ্যে আমরা উভয়ে অতিশয় ক্ষুধাতুর হয়ে পড়লাম। কুফা শহরে পৌছে আমরা একটি মসজিদে বসলাম। তখন ক্ষুধার লক্ষণ আমার মধ্যে বড় ভীষণভাবে প্রকট হয়ে পড়েছিল। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন ঃ ক্ষুধার কারণে তুমি কি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছো?' আমি বললাম ঃ 'হাঁ'। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ 'কাগজ, কলম ও দোয়াত আন।' আমি আদেশ পালন করলে তিনি কাগজে লিখলেন ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম, আয় আল্লাহ্! সর্বাবস্থায় একমাত্র তুমিই আমাদের উদ্দেশ্য, সকলের লক্ষ্য তোমারই দিকে, আমরা সর্বদা তোমার প্রশংসা, শোকরগুযারী ও যিকরে মগ্ন থাকি, কিন্তু বিবস্ত্র, নিরন্ন ও ধ্বংসন্মুখ অবস্থায় কালাতিপাতি করছি। তোমার প্রশংসা, শোকরগুযারী ও যিকর এই তিন কার্য আমার কর্তব্য বানিয়ে নিয়েছি ; এগুলোর জন্য আমি দায়ী। তুমি অপর তিন বস্তু অর্থাৎ, অন্ন, পানি ও বস্ত্র আমাকে সরবরাহ কর এবং এগুলোর জন্য তুমি জামিন থাক। আমি যদি তোমাকে ছাড়া আর কারও প্রশংসা করি, তবে সেটা হবে আমার জন্য অগ্নিকুণ্ড। ফলে, দোযখের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া আমার ভাগ্যে আর কিছু থাকবে না।' এই কথাগুলো লিখে কাগজখণ্ডটি আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ 'এটি নিয়ে বের হয়ে যাও এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কিছুতে মন লাগিয়ো না। প্রথমেই যার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ে, তার হস্তে এই কাগজখণ্ডটি প্রদান কর।' আমি কাগজখণ্ডটি নিয়ে বাইরে এসেই দেখলাম, এক ব্যক্তি উষ্ট্রারোহণে পথ অতিক্রম করছে। আমি তার হস্তে সেই কাগজখণ্ডটি দিলাম। কাগজখণ্ডটি পাঠ করে সে কাঁদতে লাগলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এই চিঠির লিখক কোথায় আছেন?' আমি তাঁর ঠিকানা দিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি ছয় শত দীনারপূর্ণ একটি থলি আমার

হাতে দিলেন। আমি পার্শ্ববর্তী লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে তার পরিচয় জানতে পারলাম, তিনি একজন খৃষ্টান। অতঃপর আমি হযরত ইব্রাহীম আদ্হামের খেদমতে হাজির হয়ে সমস্ত কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ 'থলিতে হাত লাগিয়ো না, এই থলির মালিক শীঘ্রই এখানে আসছে।' ইতিমধ্যে সেই খৃষ্টান লোকটি এসে উপস্থিত হলো এবং হযরত ইব্রাহীম আদ্হামের পদচুম্বন করে তাঁর হস্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলো।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরশ বহনকারী ফেরেশ্তাদেরকে সৃষ্টি করে হুকুম করলেন ঃ 'তোমরা আমার আরশ বহন কর।' কিন্তু তারা তা' বহন করতে অক্ষম হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বহনকারী ফেরেশ্তার সহযোগিতার জন্য সমগ্র জগতে বিস্তৃত ফেরেশ্তাকুলের সমপরিমাণ আরও ফেরেশতা সৃষ্টি করে সমবেতভাবে সকলকে আরশ বহন করার হুকুম করলেন। কিন্তু এবারও তারা অপারগ হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম করলেন,—তোমরা সকলেই لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়ে নাও। এভাবে তারা আল্লাহ্ তা'আলার মহান আরশকে উত্তোলন করতে সক্ষম হলো ; কিন্তু তাদের পদভর যমীনের সপ্তম তবকের বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে গেল। ফলে, সকলেই নিম্নদিকের আশংকাজনক অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আরশকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে এবং সর্বদা শঙ্কিত অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠে নিমগ্ন রয়েছে। এ হলো মহামহিয়ান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের আরশ বহনকারী ফেরেশ্তাদের অবস্থা। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই তাদেরকে এই মহান কাজের তাওফীক দিচ্ছেন। বস্তুতঃ এটা তাঁর অনন্ত কুদরত ও অসীম ক্ষমতার সামান্যতম প্রকাশ মাত্র।

বর্ণিত আছে,—'যে ব্যক্তি উপরোক্ত আয়াতখানি (حَسْبِيَ اللّٰهُ..... الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ) সকাল-সন্ধ্যা সাতবার করে পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত কাজ সহজ করে দিবেন এবং সকল দুশ্চিন্তা ও বালা-মুসীবত দূর করে তাকে সাহায্য করবেন।

অধ্যায় ঃ ৩১

দুনিয়ার অপকারিতা ও দুনিয়াত্যাগ

দুনিয়ার অপকারিতা ও অসারতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহুসংখ্যক আয়াত রয়েছে। কুরআন মজীদের বৃহত্তর অংশে দুনিয়ার তুচ্ছতা ও অপকারিতার কথাই আলোচিত হয়েছে। উদ্দেশ্য, বান্দাদিগকে দুনিয়ার প্রতি নিরুৎসাহিত ও আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট করা। বরং তা-ই ছিল সমস্ত নবী-রসূলের আগমনেরও উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনের এতদসম্পর্কিত দলীলসমূহ সুস্পষ্ট। তাই, বর্ণনা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে এখানে আমরা কিছু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত করছি।

বর্ণিত আছে,—'রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মরা বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের ধারণা কি এই যে,—এ বকরীর মালিকের দৃষ্টিতে এটি মূল্যহীন ছিলো? তাঁরা বললেন, মূল্যহীন ও অপদার্থ ভেবেই তো দূরে নিক্ষেপ করেছে। হুযূর বললেন, ঐ আল্লাহ্র কসম যার হাতে আমার প্রাণ, সমগ্র দুনিয়া আল্লাহ্র নিকট এ মৃত বকরীর চেয়েও নিকৃষ্ট। আল্লাহ্র কাছে দুনিয়ার মূল্য যদি মশার ডানা বরাবরও হতো তা' হলে কোন কাফেরকে তিনি এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

'দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য বেহেশ্তখানা।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا مَا كَانَ لِلّٰهِ مِنْهَا۔

'দুনিয়া অভিশপ্ত, দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছু অভিশপ্ত ; কেবল ঐ হিস্যাটুকু ছাড়া যা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত।'

হযরত আবূ-মূসা আশ্‌আরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى۔

'যে দুনিয়াকে ভালবাসে, সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে আখেরাতকে ভালবাসবে, সে দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তোমরা চিরস্থায়ীকে ক্ষয়িষ্ণু ও ধ্বংসশীলের উপর প্রাধান্য প্রদান কর।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ۔

'দুনিয়ার মহব্বত ও লিপ্সা সমস্ত গুনাহের মূল।'

হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু-বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছিলাম। তিনি কোন পানীয় চাইলেন। তাঁর সম্মুখে পানি ও মধু পেশ করা হলো। পান করার জন্য হাতে নিয়েই তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরাও কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তাদের কান্না থামলো। কিন্তু হযরত আবু-বকর (রাযিঃ)-এর কান্না থামলো না। তাঁর অশ্রুধারা যেন আরও প্রবাহিত হচ্ছে। উপস্থিতরা ভাবলেন, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করার কোন উপায় নাই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি চোখের পানি মুছলেন। লোকেরা আরজ করলেন, হে রাসূলে খোদার সত্য খলীফা! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। দেখলাম, তিনি কি যেন অপসারণ করছেন, অথচ আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি সরাচ্ছেন? তিনি বললেন, তা ছিল দুনিয়া। আমার সম্মুখে হাজির হয়েছিল। আমি তাকে বললাম, আমার কাছ থেকে সরে যাও। সরে গিয়ে সে আবার ফিরে এসে বলতে লাগলো, আপনি যদিও আমা থেকে দূরে থাকছেন, আপনার পরবর্তীরা কিন্তু আমা হতে দূরে থাকবে না।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ চিরনিবাস আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসীদের দেখে বিস্ময় লাগে যে, (কিভাবে তারা) ধোকার আবাস দুনিয়ার জন্য মেহনত করে চলেছে। বর্ণিত আছে, একদা তিনি এক আবর্জনা স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, দুনিয়ার পানে আস! এই বলে, আবর্জনার মধ্য হতে একটা পচা অংশ তুলে নিলেন যাতে পুরানো হাড্ডিসমূহ পড়েছিল। অতঃপর বললেন, এই হলো দুনিয়া। এতে ইশারা ছিল যে, দুনিয়ার যত রূপ-রঙে অচিরেই পচন ধরবে, তা ঐ পচা আবর্জনাখণ্ডের মত। এই সুন্দর শরীর অচিরেই কেবল হাড্ডি আর হাড্ডিতে পরিণত হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

'দুনিয়া সবুজ (মনোহারা), মিষ্টি (ও লোভনীয়)। আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে এর মালিক বানিয়ে দেখতে চান যে, তোমরা কি আমল কর, কিরূপ জিন্দেগী বানাও।'

বনী ইসরাঈলদের যখন বিপুল প্রাচুর্যের অধিকারী করে দেওয়া হলো তখন তারা নারী, অলঙ্কার, পোশাক-আশাক ও সুগন্ধ দ্রব্যাদির মধ্যে ডুবে গেলো। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, তোমরা দুনিয়াকে নিজেদের 'রব্ব' করো না ; অন্যথায় দুনিয়া তোমাদেরকে তার গোলামে পরিণত করবে। যা তোমার 'নিজস্ব সম্পদ' তা নিজের হিফাযতে রাখ, তা বরবাদ হবে না। কারণ, পার্থিব স্বার্থে সম্পদ জমাকারীদের উপর সমূহ বিপদের আশংকা। কিন্তু 'আল্লাহ্‌র সম্পদের' যারা অধিকারী তাদের কোন বিপদের আশংকা নাই।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হে আমার সাহায্যকারী বন্ধুগোষ্ঠী! তোমাদের স্বার্থে আমি দুনিয়াকে তার মুখের উপর নিক্ষেপ করেছি। তাই, আমার পরে তোমরা যেন শ্রদ্ধা-ভক্তি শুরু না কর। কারণ, দুনিয়ার অন্যতম অপকারিতা হলো, আখেরাত বিসর্জন দেওয়া ব্যতীত 'দুনিয়া' মিলে না। তাই, দুনিয়ার প্রীতিমুক্ত থেকেই জীবন কাটিয়ে দাও। দুনিয়াকে আবাদ করো না। এও মনে রাখ যে, দুনিয়ার মোহই

সকল পাপের মূল। অনেক সময় কিছুক্ষণের মোহগ্রস্ততা দীর্ঘকালের দুঃখ ও বিপদ ডেকে আনে।

তিনি আরও বলেন, দুনিয়াকে তোমাদের জন্য বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা তার পিঠে সওয়ারও হয়ে গেছ। এখন রাজন্যবর্গ ও নারীদের যেন দুনিয়ার প্রশ্নে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া না করতে হয়। দুনিয়ার জন্য তাদের সাথে সংঘর্ষ করো না। কারণ, তোমরা যদি দুনিয়াকে তাদের হাতে ছেড়ে দাও এবং তাদের সঙ্গে ভাগ না বসাতে চাও, তা' হলে তারাও তোমাদের সঙ্গে কোন ঝগড়া-ঝাটি বাঁধাবে না। আর নারীদের থেকে আত্মরক্ষার পথ হলো, তোমরা রোযা রাখতে ও নামায পড়তে থাকবে।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلدُّنْيَا طَالِبَةٌ وَمَطْلُوْبَةٌ فَطَالِبُ الْاٰخِرَةِ تَطْلُبُهُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَسْتَكْمِلَ فِيْهَا رِزْقَهُ وَطَالِبُ الدُّنْيَا تَطْلُبُهُ الْاٰخِرَةُ حَتّٰى يَجِيْئَ الْمَوْتُ فَيَأْخُذُ بِعُنُقِهِ

'দুনিয়া স্বয়ং প্রার্থী এবং প্রার্থিতও। যে আখেরাত অন্বেষণ করে, দুনিয়া তাকে খুঁজে বেড়ায়। ফলে, রিযিক পরিপূর্ণ হয়ে তার হাতে পৌঁছে যায়। আর যে দুনিয়াকে খুঁজে বেড়ায়, ওদিকে আখেরাত তাকে খুঁজে কাটায়। অবশেষে মৃত্যু এসে তার ঘাড় ধরে টান মারে।'

হযরত মূসা বিন ইয়াসার (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَاِنَّهُ مُنْذُ خَلَقَهَا لَمْ يَنْظُرْ اِلَيْهَا ـ

'আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার চাইতে ঘৃণ্য-জঘন্য আর কিছু সৃষ্টি করেন নাই। তাকে সৃষ্টি করবার সময় আল্লাহ্ পাক তার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই।'

বর্ণিত আছে, হযরত সুলাইমান ইব্‌নে দাউদ (আলাইহিমাস সালাম) তাঁর সেই 'তখতে সুলাইমানী'তে কোথাও যাচ্ছিলেন। পাখীরা উপর হতে

ছায়া করে রেখেছিল। ডানে-বামে ছিল মানব ও জ্বিনের দল। সিংহাসনটি জনৈক আবেদের (বুযুর্গের) নিকট দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র কসম, হে দাউদের পুত্র! আল্লাহ্ তোমাকে বিশাল রাজত্বের অধিপতি করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সুলাইমান (আঃ) তাঁর কথাটা কানে পৌঁছতেই জবাব দিলেন, শোন,—একবার সুব্‌হানাল্লাহ্ সেই বস্তুর (দুনিয়ার) চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমাকে যার অধিপতি করা হয়েছে। কারণ, দাউদের ছেলে যে জিনিসের অধিকারী তা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ; আল্লাহ্‌র তস্‌বীহ চিরদিন বাকী থাকবে, কোনদিন তার ধ্বংস নাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝

'প্রাচুর্যের মোহ ও প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আল্লাহ্-ভোলা করে রেখেছে।' (তাকাসুর ঃ ১) আদম-সন্তান কেবল বলে বেড়ায়, আমার মাল, আমার মাল। অথচ, তোমার মাল শুধু অতটুকু যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ কিংবা পরিধান করে পুরাতন করেছ অথবা সদ্‌কা করে আল্লাহ্‌র কাছে জমা করেছ।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَّا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهُ وَعَلَيْهَا يُعَادِيْ مَنْ لَّا عِلْمَ لَهُ وَعَلَيْهَا يَحْسُدُ مَنْ لَّا فِقْهَ لَهُ وَلَهَا يَسْعٰى مَنْ لَّا يَقِيْنَ لَهُ ـ

যার (দ্বিতীয়) কোন ঘর নাই, দুনিয়া তার ঘর। যার মাল বলতে কিছু নাই, দুনিয়া তার মাল। যার আকল-বুদ্ধি বলতে নাই, সে-ই দুনিয়ার জন্য জমা করে। যার বিদ্যা-জ্ঞান মোটেও নাই, সে-ই দুনিয়ার প্রশ্নে শত্রুতা করে। যার কোন বুঝ নাই সে-ই তার জন্য হিংসা করে। যার মধ্যে ইয়াকীন নাই সে-ই তার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তিনি আরও বলেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ وَالدُّنْيَا اَكْبَرُ هَمِّهٖ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَيْءٍ الخ

'দুনিয়াই সবচে বড় ফিকির'—এই অবস্থায় যার সকাল হয়— তার (ভালাইর) কোন যিম্মাদারী আল্লাহ্‌র উপর থাকে না। আল্লাহ্ পাক চারটি জিনিসকে তার অন্তরের আবশ্যিক অনুসঙ্গ করে দেন ঃ এমন পেরেশানী যা থেকে কখনও নিস্কৃতি মিলে না, এমন ব্যস্ততা যদ্দরুণ কখনও ফুরসৎ মিলে না, এমন অভাব-অনটন যা তাকে সচ্ছলতার মুখ দেখতে দেয় না, এমন আশা যা কোনদিন পুরা হয় না।'

হযরত আবূ-হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন ঃ হে আবূ-হুরায়রাহ্! আমি কি তোমাকে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে—সব দেখিয়ে দিবো? আমি বললাম, জ্বী-হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি আমার হাত ধরে আমাকে মদীনার এক উপত্যকায় নিয়ে গেলেন—যেখানে আবর্জনার একটা স্তুপ পড়েছিল। তা ছিল মাথার খুপরি, পচা-গলিজ, পুরনো-জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড ও কঙ্কালের স্তুপ। বললেন, হে আবূ-হুরায়রাহ্! এই খুপরিগুলোও তোমাদের মত কত লালসা, কত রকমের আশা পোষণ করতো। আজ দেখ, তা হাড্ডিসার হয়ে পড়ে আছে। তাদের চামড়াগুলো খাক হয়ে গেছে। এই যে ময়লার ডিপো দেখছো, এ হলো তোমাদের উদরের খাদ্যসমূহ, যা তোমরা বিভিন্ন জায়গা হতে উপার্জন করেছিলে এবং উদরে ভরেছিলে। কিন্তু পেট সেগুলো বাইরে ঢেলে দিয়েছে। মানুষ আজ তাদের দেখে ঘৃণা করছে। আর এই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড হচ্ছে তোমাদের পোশাক-আশাক যা তোমাদের দেহের শোভা ছিল। আজ তা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর এই যে কঙ্কালগুলো, এ সেই কঙ্কাল যার উপর ভর করে শহর-বন্দর চষে বেড়াচ্ছিলে। দুনিয়ার পরিণতির জন্য কারো যদি কাঁদতে ইচ্ছা হয়, তবে এ করুণ দশা দেখে সত্যি কাঁদা উচিত।—বর্ণনাকারী বলেন, হুযূরের এ কথা শ্রবণে আমাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেলো।

দাঊদ ইব্‌নে হেলাল (রহঃ) বলেন, ইব্‌রাহীমী সহীফাসমূহে লেখা ছিল ঃ হে দুনিয়া! দেখ, নেক মানবদের চোখে তুমি কত মূল্যহীন, অথচ

তুমি তাদের শোভা-সৌন্দর্য ছিলে। কিন্তু, আমি তাদের অন্তরে তোমার প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করেছি, তাদেরকে তোমা থেকে দূরে রেখেছি। ঘৃণ্য ও ধ্বংসশীল বস্তুনিচয়ের মধ্যে তোমাকেই আমি সর্বাধিক নিকৃষ্ট করে সৃষ্টি করেছি। আমার ফয়সালা এই যে, তুমি কারো জন্য চিরস্থায়ী হবে না এবং কেউ তোমার চিরসাথী হবে না ; চাই দুনিয়াদার লোকেরা যত কার্পণ্য-কঞ্জুসীই করুক না কেন। আর যাদের হৃদয় সত্য, খাঁটিত্ব, সত্যের উপর মজবুতি ও অবিচলতা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্টির দৌলতে পরিপূর্ণ, সেই নেক্-মানবদের প্রতি আমার সুসংবাদ। তাদের জন্য আমার অন্যতম পুরস্কার এই যে, কবর হতে উত্থানকালে তাদের সম্মুখে থাকবে নূর ও জ্যোতি এবং ফেরেশ্‌তাগণ চতুর্দিক হতে তাদের বেষ্টন করে রাখবে। এভাবে তাদেরকে আমার 'রহ্‌মত' পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে—অন্তরে যে রহ্‌মতের তারা আশা পোষণ করছিল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে সৃষ্টি করার পর তা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত ছিল। আল্লাহ্ পাক তার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌কে বলবে ঃ হে মহান প্রতিপালক! আপনার ওলীদিগের মধ্যে আমার কিছু অংশ বিতরণের জন্য আজ আমায় অনুমতি দিন। আল্লাহ্ বলবেন, ওরে নিকৃষ্ট, তাদেরকে তোর মত নিকৃষ্টের কিছু অংশ দিতে দুনিয়াতেই আমি রাজী ছিলাম না। আজ (ওদের পরম ইয্‌যত ও পুরস্কার দিবসে) কিভাবে তাতে আমি সম্মত হতে পারি?

বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আঃ) যখন নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন, তখন তার পেটের ভিতর মল নিঃসারণের জন্য মোড় দিয়ে উঠে। এ ত্রুটি বেহেশ্‌তের বৃক্ষরাজির মধ্যে অন্য কোনটিতে ছিল না। বস্তুতঃ এজন্যই নিষেধ করা হয়েছিল। যাক, হযরত আদম (আঃ) তখন বেহেশ্‌তের মধ্যে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলেন। আল্লাহ্ পাক জনৈক ফেরেশ্‌তাকে বললেন, আদমকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সে চায় কি? তিনি জবাব দিলেন, কষ্টদায়ক গলীয বাইরে নিক্ষেপ করতে চাই। আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্‌তাকে বললেন, জিজ্ঞাসা কর, কোথায় ফেলতে চায়, ফরাশের উপর না পালংকের উপর? নাকি নহরের মাঝে না বৃক্ষের ছায়ায়? এ কাজের উপযুক্ত কোন স্থান আছে বেহেশ্‌তের

মাঝে? নাই। এজন্যই তাকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ক্বিয়ামতের দিন এমন বহু লোককেও হাজির করা হবে যাদের আমল হবে তেহামার পাহাড় সম ; কিন্তু তাদের দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তারা কি নামাযী? তিনি বললেন, হাঁ, তারা নামাযও পড়বে রোযাও রাখবে। কিন্তু রাত্রিকালে পাপে লিপ্ত হবে এবং দুনিয়া লাভের সুযোগ পেলে লাফিয়ে ছুটবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খুৎবায় বলেছিলেন ঃ

الْمُؤْمِنُ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضٰى لَا يَدْرِىْ مَا اللّٰهُ صَانِعٌ فِيْهِ وَبَيْنَ اَجَلٍ قَدْ بَقِىَ لَا يَدْرِىْ مَا اللّٰهُ قَاضٍ فِيْهِ فَلْيَتَزَوَّدِ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهٖ لِنَفْسِهٖ وَمِنْ دُنْيَاهُ لِاٰخِرَتِهٖ وَمِنْ حَيَاتِهٖ لِمَوْتِهٖ وَمِنْ شَبَابِهٖ لِهَرَمِهٖ فَاِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَاَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْاٰخِرَةِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَلَا بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ دَارٍ اِلَّا الْجَنَّةُ اَوِ النَّارُ

মু'মিন দু' প্রকার ভয়ের মাঝখানে জীবন কাটায় ঃ এক. অতীত জীবনের ভয়। কারণ, সে জানে না, অতীতের কার্যকলাপের জন্য আল্লাহ্ পাক কি ফয়সালা করেন। দুই. অবশিষ্ট জীবনের ভয়। কারণ, সে সম্পর্কেও আল্লাহ্র কি ফয়সালা তা জানা নাই। এজন্যই বান্দার উচিত এ দীর্ঘ পথের সম্বল যোগাড় করা, দুনিয়াতেই আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা, বেঁচে থাকতে মৃত্যুর সামান সঞ্চয় করা, যৌবনেই বার্ধক্যের জন্য বিহিত ব্যবস্থা করা। কারণ, দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের জন্য আর তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের জন্য। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, মৃত্যুর পরে ক্লান্তি-শ্রান্তির কোন কাজ আর নাই এবং দুনিয়ার পরে বেহেশ্‌ত বা দোযখ ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঘর-বাড়ী নাই।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, আগুন আর পানি যেমন এক পাত্রে একত্রিত হতে পারে না, তদ্রূপ মু'মিনের দিলে দুনিয়া ও আখেরাতের মহব্বতও সমান শিকড় গাড়তে পারে না।

বর্ণিত আছে, হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) হযরত নূহ্ (আঃ)-কে বলেছিলেন, নবীকুলের মধ্যে সর্বাধিক দীর্ঘজীবি হে নবী! দুনিয়াকে আপনি কেমন পেলেন? তিনি বললেন, যেমন অনেকগুলো দরজাবিশিষ্ট একটা ঘর—যার এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আর এক দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম।

কেউ হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলেছিল, থাকার একটা ঘর বানিয়ে নিন না। তিনি জবাব দিলেন, আমার পূর্ববর্তীরা যে ঘর বানিয়ে রেখে গেছে, আমার জন্য যথেষ্ট।

হযরত হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাঝে আগমন করলেন। বললেন, তোমরা কি চাও যে, তোমাদের অন্ধত্ব দূর হয়ে তোমরা চক্ষুষ্মান হয়ে যাও? মনে রেখো, যে যে-পরিমাণ দুনিয়ার মোহগ্রস্ত হয় এবং দীর্ঘ আশা পোষণ করে, আল্লাহ্ পাক সে-অনুযায়ী তার দিলকে অন্ধ করে দেন। আর যে দুনিয়া-বিমুখ হয় এবং আশাকে স্বল্প ও সংযত রাখে, আল্লাহ্ পাক তাকে শিক্ষা করা ছাড়াই ইলম্ দান করেন, কারো বাতলানো ছাড়াই হিদায়তের সরল পথ-প্রাপ্ত করেন। মনে রেখো, তোমাদের পর এমন কিছু লোকের জন্ম হবে যাদের রাজত্ব হবে হত্যা ও অত্যাচারের রাজত্ব। গর্ব ও কার্পণ্যই হবে তাদের বড় সম্পদ ; মনের কু-পরামর্শাদির অনুসরণই হবে তাদের 'ভালবাসা'। মনে রেখো, কেউ যদি সেই যমানা পাও তবে ধনবান হওয়ার ক্ষমতা সত্ত্বেও দারিদ্র্য নিয়েই ছবর করবে। অসৎদের সাথে মহব্বতের ক্ষমতা থাকলেও তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণকেই মেনে নিও, পরাক্রমের ক্ষমতা সত্ত্বেও দুর্বল থাকাই মেনে নিও। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই যদি হয় এ সবকিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য, তা' হলে আল্লাহ্ পাক তাকে পঞ্চাশ সিদ্দীকিনের বরাবর ছওয়াব দান করবেন।

বর্ণিত আছে, একদা মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতসহ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত

হচ্ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তখন কোন আশ্রয় খুঁজছিলেন। দূর হতে একটা তাঁবু দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখেন, তাঁবুর মধ্যে রয়েছে একজন মেয়ে মানুষ। তাই সেখান থেকে সরে আসেন। অতঃপর পাহাড়ের একটা গুহা লক্ষ্য করে সেখানে চলে যান। গিয়ে দেখেন, গুহার মধ্যে এক সিংহ। তিনি তার পিঠে হাত রেখে দো'আ করতে লাগলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! সবার জন্যই আপনি কোন আশ্রয়স্থল রেখেছেন। কিন্তু আমার কোন আশ্রয়ঘাঁটি নাই। আল্লাহ্ পাক তখন ওহী নাযিল করলেন, হে ঈসা! আমার রহমতই তোমার আশ্রয়ঘাঁটি। ক্বিয়ামতের দিন আমার হাতে সৃষ্ট একশত হূরের সঙ্গে তোমাকে বিবাহ দেবো। চার হাজার বছর নাগাদ তোমার ওলীমার খানা খাওয়াবো—যার এক একটি দিন হবে দুনিয়ার বয়সের সমান। আমি ঘোষণাকারীদের হুকুম করবো, তারা ঘোষণা করবে ঃ কোথায় দুনিয়াত্যাগী বান্দারা? হে দুনিয়াত্যাগী যাহেদগণ! ঈসা ইব্নে মরিয়মের শাদী-মোবারকে অংশগ্রহণ করুন।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ দুনিয়াদারদের বরবাদির জন্য আক্ষেপ! কিভাবে তাদের মৃত্যু হবে? ধোকার দুনিয়া, শোভা-সৌন্দর্য ও যাবতীয় মালিকানা ত্যাগ করে রওনা হতে হবে। ধোকাগ্রস্তদের প্রতি আক্ষেপ! কি হালত হবে যখন তারা তাদের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি (আযাব) দেখবে আর যা (দুনিয়া) ছিল তাদের পরম বাঞ্ছিত তা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ, প্রতিশ্রুত সেই দিনটি আসবেই। —দুনিয়াই যার একমাত্র ধান্দা আর আমল বলতে শুধু গুনাহ্ আর গুনাহ্—হায়, কি ধ্বংসাত্মক পরিণাম হবে তাদের। পাপের প্রায়শ্চিত্তে তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেছিলেন ঃ 'হে মূসা! যালিমদের ঘরের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক? তা তোমার ঘর কিছুতেই নয়। এই ঘরের খেয়াল তুমি দিল থেকে বের করে দাও, দূর করে ফেল। যালিমদের ঘর জঘন্য ঘর। হাঁ যে-ব্যক্তি সেখানে নেক আমল করে তার জন্য তা' কল্যাণময় ঘর বটে। হে মূসা! আমি যালিমদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছি। আমি মযলূমের প্রতিশোধ অবশ্যই নিবো।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ-

উবাইদাহ্ ইবনুল-জাররাহ্ (রাযিঃ)-কে বাহ্রাইনে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বহু মালামাল সহ বাহ্রাইন থেকে ফিরে আসেন। আনসারগণ এ খবর শুনলেন এবং হুযূরের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর তাদের দিকে মুখ করে বসলেন। তিনি তাদের দেখে মৃদু হেসে বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ যে, আবূ-উবাইদাহ্ কিছু নিয়ে এসেছে। তারা বললেন, জ্বী-হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, ঠিক আছে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্ যা কিছু দান করেন তার আশা রাখ। কিন্তু, আল্লাহ্র কসম, দারিদ্র্যকে আমি তোমাদের জন্য আশংকাজনক মনে করি না। বরং আমার ভয় হয় যে, না-জানি তোমাদেরকে দুনিয়ার বিপুল ভাণ্ডারের অধিকারী করে দেওয়া হয়, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের বেলায় তা' ঘটেছিল। অতঃপর তোমরা দুনিয়া-কামাইর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে যাও, যেভাবে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল। পরিণামে দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দেয়, যেভাবে তাদের ধ্বংস করেছিল।

হযরত আবূ-সাঈদ খুদ্রী (রাঃ)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যে-জিনিসটিকে তোমাদের জন্য সর্বাধিক ভীতিপ্রদ মনে করি, তা-হলো, আল্লাহ্ কর্তৃক পৃথিবীর বরকত-ভাণ্ডার খুলে দেওয়া। জিজ্ঞাসা করা হলো, পৃথিবীর বরকত-ভাণ্ডার মানে? তিনি বললেন, দুনিয়ার ধন-সম্পদ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিজেদের অন্তরসমূহকে দুনিয়ার ভাবনায় মশগুল রেখো না। দুনিয়া উপার্জন দূরের কথা, দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা থেকেও তিনি নিষেধ করেছেন।

হযরত আম্মার বিন সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) এক বস্তির উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, বস্তিবাসীরা ঘরের আঙ্গিনায় ও রাস্তার মধ্যে লাশ হয়ে পড়ে আছে। তিনি বলে উঠলেন ঃ হে আমার হাওয়ারী দল! আল্লাহ্র গযব এদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। তা' না-হয়ে যদি অন্য কিছু হতো তা'হলে অবশ্যই তারা দাফনকৃত থাকতো। তারা বললেন, হে রূহুল্লাহ্! এদের কি খবর তা' জানতে আমাদের আগ্রহ। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট এ মর্মে দো'আ করলেন। আল্লাহ্ পাক ওহী

করলেন যে, রাত্রি এলে ওদের আওয়ায দিও, ওরা তোমাকে জবাব দিবে। রাত্রিবেলা তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ হে বস্তিবাসীরা! জবাব এলো, লাব্বাইক ইয়া রূহুল্লাহ্। তিনি বললেন, বল দেখি, তোমাদের কি ঘটনা? তাদের একজন বললো, আমরা নিরাপদে রাত যাপন করছিলাম। সকাল হলেই আমরা এ লাঞ্ছনার শিকার হলাম। তিনি বললেন, এর কারণ কি? বললো, দুনিয়ার ভালবাসা আর না–ফরমানদের অনুকরণ–অনুসরণ। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা দুনিয়াকে কিরূপ ভালবাসতে? জবাব এলো ঃ যেভাবে শিশু তার মা–কে ভালবাসে। মা কাছে আসলে সে আনন্দিত হয় আর চলে গেলে সে বিষন্ন হয়ে যায় এবং কান্না আরম্ভ করে—আমাদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। আবার জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা, তোমার সঙ্গীদের কি অবস্থা? তারা যে কোন জবাব দিচ্ছে না? সে বললো, কারণ, তারা নিষ্ঠুর–নির্দয়–কঠিনপ্রাণ ফেরেশ্তাদের হাতে 'আগুনের লাগাম' পরানো অবস্থায় রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, তা' হলে তুমি কিভাবে জবাব দিচ্ছো? সে বললো, কারণ, আমি তাদের মাঝে বাস করতাম বটে, তবে আমি তাদের অনুসারী ছিলাম না। কিন্তু, যখন তাদের উপর আযাব আসলো তা' আমাকেও গ্রাস করলো। আমি এখন জাহান্নামের তীরে পড়ে আছি, জানিনা আমার মুক্তি হবে, নাকি মস্তক নিম্নমুখী করে জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর হাওয়ারীদিগকে বললেন ঃ মোটা লবন দিয়ে রুটি খাওয়া, মোটা কাপড় পরিধান করা এবং আঁস্তাকুড়ের নিদ্রাও অনেক বড় কিছু—যদি তাতে অন্তরের শান্তি ও দোজাহানের কল্যাণ থাকে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উষ্ট্রী 'আয্বা' (এত দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল যে,) কেউ তার আগে যেতে পারতো না। একদা জনৈক বেদুঈনের উষ্ট্রী আয্বা–র আগে চলে গেলে সাহাবীদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহ্ পাকের বিধান যে, যে–কোন বস্তুর উত্থানের পর আবার তিনি তার পতন ঘটান, (জোয়ারের পর ভাটাও সৃষ্টি করেন)।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ সাগরের তরঙ্গের উপর কি কেউ প্রাসাদ নির্মান করে? দুনিয়াটাও ঠিক অনুরূপ। তাই, এখানে 'সুখের নীড়' গড়তে

যেওনা। লোকেরা হযরত ঈসা (আঃ)–কে বলেছিল যে, আপনি আমাদিগকে এমন একটা ইল্ম শিখিয়ে দিন যার ফলে আল্লাহ্ পাক আমাদের মহব্বত করবেন। তিনি উত্তর দিলেন, দুনিয়াকে ঘৃণা কর তা' হলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন।

হযরত আবু–দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে তা' হলে তোমরা কম হাসতে, বেশী বেশী কাঁদতে এবং দুনিয়া তোমাদের চোখে মুল্যহীন হয়ে যেত ; আখেরাতকে তোমরা সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতে। হযরত আবু–দারদা (রাযিঃ) উক্ত হাদীস শোনানোর পর নিজের পক্ষ থেকে বললেন, যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে তা' হলে তোমরা জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতে, নিজেদের জীবনের জন্য অশ্রু ঝরাতে, যাবতীয় সম্পদ–সম্পত্তি তোমরা পাহারাদার বিহীন ফেলে রাখতে, অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া সেসবের কোন খোঁজ–খবরই নিতে না। কিন্তু, ব্যাপার হলো, দুনিয়ার মোহ–মায়া তোমাদের মন থেকে আখেরাতের চিন্তা–ভাবনা মুছে দিয়েছে। ফলে, দুনিয়া তোমাদের প্রভু আর তোমরা তার গোলামে পরিণত হয়েছ। তোমরা যেন আজ নির্বোধদের দলভুক্ত। চতুষ্পদ জন্তুরা যেমন পরিণাম চিন্তা করে কোন বিপদজ্জনক পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকে না—আজ তোমাদের অনেকের অবস্থা অবিকল সে–রকম। তোমরা একই দ্বীনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসা, কল্যাণকামিতা নাই। আসলে তোমাদের অন্তর বড় জঘন্য, সেই জঘন্য মন–মানসিকতাই তোমাদিগকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তোমরা সবাই যদি সৎ ও নেক হয়ে যেতে তা' হলে অবশ্যই তোমাদের মাঝে সম্প্রীতি গড়ে উঠতো। তোমাদের হলো কি, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে যেমনটা উদ্দীপিত হও, অন্যদেরও তাতে সহায়তা কর কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে তোমাদের মাঝে সেই উৎসাহ অনুরাগের আদান–প্রদান পরিলক্ষিত হয় না। তোমরা তোমাদের প্রিয়জনদের নসীহত কর না। এটা তোমাদের অন্তরে ঈমানের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। দুনিয়াতে লাভ–ক্ষতিকে যেরূপ বিশ্বাস কর, আখেরাতের লাভ–ক্ষতি, শান্তি–অশান্তিকে যদি সে–রকম বিশ্বাস করতে, তা'হলে নিশ্চয়ই তোমরা আখেরাতের কাজের প্রাধান্য দিতে—সবকিছুর উর্ধ্বে জানতে। কারণ, আখেরাতের চেতনা

জীবনের সবকিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করে। যদি এই প্রশ্ন তোল যে নগদের প্রতি আকর্ষণ স্বভাবতই প্রবল থাকে ; তা' হলে বলবো, তোমরা দুনিয়ার বহু নগদ স্বার্থকে কোন বিলম্বিত স্বার্থের জন্য জলাঞ্জলি দিচ্ছো, পরন্তু সেজন্য কঠিন পরিশ্রমও করে চলেছো। অথচ, এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা তোমাদের হাতে আসার নিশ্চয়তা থাকে না। এ-তো জ্বলন্ত সত্য। তাই বড়ই নিকৃষ্ট সমাজ তোমরা, আজও তোমরা তোমাদের ঈমানকে বলিষ্ঠ ও যৌবন-প্রাপ্ত করতে পার নাই। আর যদি তোমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত দ্বীন সম্পর্কেই সন্দেহের শিকার হয়ে গিয়ে থাক তা' হলে আস, তোমাদের সেই নূর ও আলোকোজ্জ্বল পথ দেখিয়ে দিই যা তোমরা আন্তরিকভাবে মানতে বাধ্য হবে। তোমরা এতটা নির্বোধ নও যে, তোমাদের নির্দোষ কিংবা দায়িত্বমুক্ত বলা যেতে পারে। দুনিয়ার কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তো তোমরা পাকা বুদ্ধির পরিচয় পেশ কর। সেক্ষেত্রে তো কোন অসাবধানতা বা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় না। কি আশ্চর্য! দুনিয়ার সামান্য অংশ লাভেও তোমরা উল্লাসে ফেটে পড় আর সামান্য ক্ষতির জন্য দুঃখিত হও এবং তা তোমাদের চোখে মুখে, কথা-বার্তায়ও ফুটে উঠে। নিজেদেরকে বড় বিপদগ্রস্ত বলে চিৎকার শুরু করে দাও। অথচ তোমাদের অধিকাংশরাই দ্বীনের প্রায় সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু কই, তাদের চেহারায় বা হাল-অবস্থায় কোন বিষন্নভাব দেখা যায় না। আমার মনে হয়, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছেন।

তোমাদের অবস্থা হলো, তোমরা পরস্পর হাসি-মুখে মিলিত হও, কারো সাথে এমন আচার-আচরণ থেকে বিরত থাক যা তার কাছে অপছন্দীয়। যাতে সে তোমার সাথে কোন অবাঞ্ছিত আচরণ না করে সেজন্যই তুমি অনুরূপ কর, অথচ, হিংসা-বিদ্বেষে ভিতরটা ভর্তি হয়ে আছে। তোমাদের কামনা-বাসনার বহর অনেক দীর্ঘ। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছ। মন চায়, আল্লাহ্ পাক আমাকে তোমাদের থেকে মুক্ত করেন এবং যাদের দীদারের জন্য আমি পাগলপারা, তাদের কাছে যেন আমাকে পৌঁছিয়ে দেন। যদি তাঁরা বেঁচে থাকতেন তবে তোমাদের মাঝে কিছুতেই তাঁরা টিকতে পারতেন না। আমার যা বলার ছিল আমি তা' বলে গেলাম ; সদিচ্ছা থাকলে এটুকুই

যথেষ্ট। তোমরা যদি সেই দৌলত খোঁজ কর যা আল্লাহ্র কাছে রয়েছে তবে খুব সহজেই তা' লাভ করতে পার। আমি আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করি।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা দ্বীনকে সুস্থ ও নিরাপদ রেখে দুনিয়ার সামান্য অংশের উপর সন্তুষ্ট থাক, যেভাবে দুনিয়াদারেরা তাদের দুনিয়াদারীকে সুস্থ ও নিরাপদ রেখে দ্বীনের সামান্য অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ দুনিয়ার রাজা-বাদশা, আমীর-উমরারা সামান্য কিছু দ্বীনদারী নিয়েই তুষ্ট, অথচ জাগতিক সুখ-সম্ভোগের বেলায় তো তাদের অল্পের উপর তুষ্ট থাকতে দেখলাম না। অতএব, হে খোদাপ্রেমিক! যেভাবে ওরা দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছে, তুমিও তদ্রূপ ওদের দুনিয়াকে তাচ্ছিল্যভরে দূরে নিক্ষেপ করে দিয়ে দ্বীনকে আঁকড়ে ধর।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ হে দুনিয়ার ভিক্ষুক! তুমি নেক হতে চেষ্টা কর। আর নেক হতে হলে তুমি দুনিয়া ত্যাগ কর।

আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে তোমাদের কাছে 'দুনিয়া' আসবে এবং তা তোমাদের ঈমানকে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলবে যেভাবে আগুন শুকনো কাষ্ঠকে খেয়ে সাবাড় করে।

আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে ওহীযোগে বলেছিলেন, হে মূসা! দুনিয়ার মহব্বতে জড়িয়ে পড়ো না। কারণ, এর চাইতে জঘন্য পাপ আর নাই। একবার হযরত মূসা (আঃ) কোথাও যাওয়ার পথে জনৈক ব্যক্তিকে কাঁদতে দেখলেন। আবার ফিরার সময়ও অনুরূপ ক্রন্দনরত দেখতে পেলেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ পরওয়ারদেগার! তোমার বান্দা তোমার ভয়ে কাঁদছে। আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ হে ইব্নে ইমরান! তার চোখের পানির সঙ্গে তার মগজও যদি গলে গলে প্রবাহিত হয় এবং মুনাজাতে হাত তুলে রাখতে রাখতে হস্তদ্বয় যদি সম্পূর্ণ অকেজোও হয়ে যায় ; তবু তাকে ক্ষমা করবো না যতক্ষণ সে দুনিয়াকে মহব্বত করবে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, যে-ব্যক্তি ছয়টি গুণের অধিকারী হবে, জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হতে মুক্তির আর কোনও পথ তাঁকে খুঁজতে

হবে না ঃ অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে চিনলো এবং তার আনুগত্য করলো ; শয়তানকে চিনলো এবং তার অবাধ্যতা করলো ; সত্যকে চিনলো এবং তার অনুসরণ করলো ; বাতিলকে চিনলো এবং তা থেকে বিরত রইলো ; দুনিয়াকে চিনলো এবং তাকে দূরে নিক্ষেপ করলো ; আখেরাতকে চিনলো এবং আখেরাত অন্বেষণে মশগুল হলো।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ পাক রহমত বর্ষণ করুন ঐ সকল লোকদের প্রতি, যাদের হাতে দুনিয়া অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা দুনিয়ার আমানত বহনের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের হাতে তা সোপর্দ করে দিয়ে নিজের বোঝা হালকা করে নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কেউ যদি তোমার সাথে দ্বীনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে তা' হলে তুমিও তার সাথে প্রতিযোগিতা কর। আর যদি দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় নামে তবে দুনিয়ার বোঝাটা তার গর্দানে তুলে দাও।

হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেছিলেন, প্রিয় বৎস! দুনিয়া এক গভীর সাগর, অসংখ্য মানুষ তাতে ডুবে ধ্বংস হয়েছে। অতএব, এ অকূল সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য তুমি তাক্‌ওয়ার নৌকা তৈরী কর, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান দ্বারা সেই নৌকা ভর্তি কর এবং সে নৌকার নোঙর হবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল। তবেই তুমি নাজাত পেতে পার। কিন্তু আমার মনে হয় না যে তুমি নাজাত পেতে পারবে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, এ আয়াত সম্পর্কে আমি যতই ভাবি, আমার ভাবনা কেবল দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকে ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝

'যমীনের উপরের বস্তুনিচয়কে আমি যমীনের জন্য 'সৌন্দর্য-শোভা' করেছি। এভাবে আমি মানুষদের পরীক্ষা করে দেখবো যে তাদের কারা কারা আমল ও জীবনকে সুন্দর করে। অনন্তর যমীনের উপরের সবকিছুকে অচিরেই আমি শূন্য ময়দানে পরিণত করবো।' (কাহ্‌ফ ঃ ৭, ৮)

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, আজ তুমি জগতের যে বস্তুর মালিক হচ্ছো, লক্ষ্য কর, তোমার পূর্বে অন্য কেউ এর মালিক ছিল, তোমার পরেও অন্য কেউ এর মালিক হবে। তোমার বলতে দুনিয়াতে শুধু রাতের এক বেলা খানা ও দিনের এক বেলা খানা ছাড়া আর কিছুই নাই। তাই, মাত্র এক গ্রাস খাবারের জন্য নিজেকে তুমি ধ্বংস করে ফেলো না। রোযাদারের খানা-পানির মত তুমি দুনিয়া ত্যাগের রোযা রাখ এবং আখেরাতে গিয়ে ইফতার করো। দুনিয়ার মূলধন হলো খাহেশাত, কামনা-বাসনা। এর লভ্যাংশ হলো জাহান্নাম।

জনৈক রাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যমানাকে আপনি কেমন মনে করেন? তিনি বললেন, যমানা মানবদেহকে পুরানো করে দেয়, নতুন নতুন আশার জালে আবদ্ধ করে, মৃত্যুকে নিকটবর্তী করে ; কিন্তু মাকসূদকে দূরে সরিয়ে রাখে। প্রশ্ন করা হলো, তা' হলে যমানার লোকদের সম্পর্কে আপনার কি মন্তব্য? তিনি বললেন, সাফল্য অর্জনকারীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর ব্যর্থকামীরা কষ্টকর পরিশ্রমে লিপ্ত আছে। জনৈক বুযুর্গ এ কথাটাই বলেছেন এ ভাবে ঃ 'দুনিয়ার কিছু সুখ সুবিধার জন্য যাকে আজ তুমি পঞ্চমুখ দেখতে পাচ্ছ, অচিরেই দেখতে পাবে, সেই ব্যক্তিটাই দুনিয়াকে কিরূপ গাল-মন্দ করছে। দুনিয়া হাসিলে যে ব্যর্থ হয়েছে, সে শুধুই আক্ষেপ করতে থাকে। আর দুনিয়া যাকে ধরা দিয়েছে, অন্তহীন চিন্তা-ভাবনা তাকে গ্রাস করেছে।'

কোন জ্ঞানীজন বলেছেন, এক সময় দুনিয়া ছিল কিন্তু আমি ছিলাম না। আবার এক সময় দুনিয়াও যাবে, আমিও থাকবো না। তাই, দুনিয়াতে আমি মন লাগাবো না। কারণ, দুনিয়ার সুখ-শান্তি ক্ষণস্থায়ী, এর স্বচ্ছ বস্তুটাও ময়লাযুক্ত। দুনিয়াবাসীরা খোদ দুনিয়ার পক্ষ হতেই বহু আশংকাগ্রস্ত। হয়তঃ প্রাপ্ত নে'আমত হারানের কিংবা কোন অজানা বিপদে আক্রান্ত হবার কিংবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আশংকা সর্বক্ষণ।

জনৈক জ্ঞানী বলেছেন, দুনিয়ার একটা দোষ এই যে, সে কোন হকদারকেই তার আসল প্রাপ্য আদায় করে দেয় না। হয়ত প্রাপ্যের চাইতে কম দিবে অথবা ক্ষমতারও বেশী ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে।

সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার তাবৎ ভোগ্য বস্তুনিচয় যেন

গযবগ্রস্ত। কারণ, তা কেবল অযোগ্যদেরই হস্তগত হয়। তোমরা কি বিষয়টা লক্ষ্য কর না?

সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার মহব্বতে পড়ে যে দুনিয়া হাসিলের চেষ্টা করে, যত পাবে ততই আরও দুনিয়া লাভের মোহগ্রস্ত হবে। অনুরূপ যে আখেরাতের মহব্বতে আখেরাত চায়, আখেরাতের পথে তার যতই অগ্রগতি সাধিত হবে ততই তার আগ্রহ ও চেষ্টার তীব্রতা আরও বেড়ে যাবে। তাই, না এইটির কোন শেষ আছে, না সেইটির কোন শেষ আছে।

এক ব্যক্তি আবূ হাযেম (রহঃ)–কে বলল, হুযুর! আমি তো দুনিয়ার মোহে আক্রান্ত ; অথচ দুনিয়া আমার বাড়ী নয়। তিনি বললেন, 'দেখ, আল্লাহ্ পাক তোমাকে যা–কিছু দান করেছেন, তার হালালটুকুই তুমি গ্রহণ কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তা' খরচ কর। তা' হলে দুনিয়ার মোহ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' এভাবে জবাব দানের কারণ এই যে, এতটুকুর জন্যও যদি তাকে শাসাতেন তা' হলে তার উপর এতটা চাপ পড়তো যে, দুনিয়ার প্রতি চরম অতিষ্ঠতা পয়দা হয়ে দুনিয়া হতে বের হয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করতো।

ইয়াহ্ইয়া বিন মু'আয (রহঃ) বলেন, দুনিয়া শয়তানের দোকান। সে দোকান থেকে কিছু চুরি করো না। অন্যথা তার মালের সন্ধানে এসে তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, দুনিয়া যদি স্বর্ণেরও হতো যা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আখেরাত যদি মাটির ঢেলাও হতো যা চিরদিন থাকবে, তা'হলে ধ্বংসশীল স্বর্ণের পরিবর্তে চিরস্থায়ী মাটির ঢেলা গ্রহণই হতো আমার যথোচিত কর্তব্য। অথচ, আজ আমরা চিরস্থায়ী স্বর্ণের পরিবর্তে ধ্বংসশীল মাটির ঢেলাই তুলে নিচ্ছি। কি হবে আমাদের অবস্থা?

আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাক। কারণ, আমার কাছে এইমর্মে একটি রেওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, কেউ যদি দুনিয়াকে বড় জানে, তা' হলে কাল ক্বিয়ামতের মাঠে তাকে হাযির করা হবে এবং বলা হবে ঃ আল্লাহ্ যাকে ঘৃণা করতেন এই লোকটা তাকে বড় বলে জানতো।

হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, প্রতিটি মানুষই মেহমান, আর তার মালও ধারকৃত। মেহমানকে বিদায় হতে হবে। ধারকৃত মালও মালিকের হাতেই ফেরত যাবে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا الْمَالُ وَالْاَهْلُوْنَ اِلَّا وَدِيْعَةٌ
وَلَا بُدَّ يَوْمًا اَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ

'মাল ও আত্মীয়–স্বজন সবই আমানত। আর আমানত অতি অবশ্যই ফেরত দিতে হয়।'

হযরত রাবে'আ (রহঃ) তাঁর কতিপয় শাগরেদকে দেখতে পেলেন, তারা দুনিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন এবং দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছেন। তিনি বললেন, হে, তোমরা চুপ কর, দুনিয়ার আলোচনা বন্ধ কর। দুনিয়ার প্রতি কোন গুরুত্ববোধ যদি তোমাদের অন্তরে না থাকতো, তা' হলে দুনিয়া সম্পর্কে এত বেশী আলোচনাও করতে না। যে যাকে ভালবাসে, তার কথা বেশী বেশী মুখে আসে।

হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আদ্‌হাম (রহঃ)–কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন ঃ 'আমরা নিজেদের দ্বীনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তদ্দ্বারা দুনিয়ার দেহে তালি দিচ্ছি। এতে আমাদের দ্বীনও ধ্বংস হচ্ছে, তালিযুক্ত দুনিয়াও ধ্বংস হচ্ছে। তাই, বড় ভাগ্যবান সেই বান্দা, যে তার পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় দুনিয়াকে কোরবান করেছে।'

এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে ঃ 'আমি দেখেছি, দুনিয়া অন্বেষণকারী যত দীর্ঘজীবনই লাভ করুক এবং যত আরাম ও সুখের প্রাচুর্যই গড়ে তুলুক না কেন, তার অবস্থা ঠিক ঐ ব্যক্তিরই মত যে কোন মযবুত ইমারত নির্মাণ করেছে। যখনই সে তার প্রাসাদে আরোহণ করলো, মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেলো। আরও কেউ বলেছেন ঃ 'ধর, দুনিয়া যদি আপনাতেই তোমার কাছে ধরা দেয়, একদিন কি তা তোমাকে ছেড়ে যাবে না? ওরে, দুনিয়া হলো ছায়ার মত। কিছুক্ষণ তোমাকে ছায়াদান করে হঠাৎ ঘোষণা করবে যে, আমি চললাম।'

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে প্রিয় বৎস! আখেরাতের স্বার্থে তুমি দুনিয়াকে বিক্রি করে দাও। তা' হলে দুনিয়া-আখেরাত দু'টিতেই তুমি লাভবান হবে। কিন্তু দুনিয়ার স্বার্থে আখেরাতকে বিক্রি করো না। তা'হলে দুনিয়া-আখেরাতে দু'টিতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে তিন ভাগ করেছেন, একভাগ মু'মিনের জন্য, একভাগ মুনাফিকের জন্য, একভাগ কাফেরের জন্য। তাই, মু'মিন নিজের সম্বল সংগ্রহে ব্যস্ত, মুনাফিক বিলাসের মোহগ্রস্ত, আর কাফেরগোষ্ঠী ভোগে মত্ত।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, দুনিয়া মুর্দা লাশ। তাই, যে দুনিয়ার কোন অংশ চায়, সে যেন নিজেকে কুকুরদের সমাজভুক্ত থাকার জন্য প্রস্তুত রাখে। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ 'হে দুনিয়ার সাথে বিবাহের প্রস্তাবকারী! এ প্রস্তাব হতে ফিরে আসাতেই তোমার মঙ্গল। যাকে তুমি আপন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও, সে যে বড় গাদ্দার। বিবাহের অনতি পরেই তোমার জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসবে।'

হযরত আবু-দার্‌দা (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়া যে আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্ট তার অন্যতম কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র যত না-ফরমানী এ দুনিয়াতেই সংঘটিত হয়। আল্লাহ্‌র কাছে কিছু পেতে হলে দুনিয়াকে বর্জন করতেই হবে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ 'কোন বুদ্ধিমান যদি দুনিয়াকে পরীক্ষা করে দেখে, তা'হলে স্পষ্টতঃই বুঝতে পারবে যে, দুনিয়া তার পক্ষে বন্ধুর লেবাসে শত্রু বৈ কিছু নয়।'

আরও বলা হয়েছে ঃ 'রাতের প্রথমাংশে সুখনিদ্রায় মগ্ন হে ব্যক্তি! বিপদ কখনও ভোররাতেও কিন্তু অবতীর্ণ হয়।' দিন-রাতের গমনাগমন ঐশ্বর্যশালী বহু জাতি-গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।' 'সময়ের পরিবর্তনধারা কত রাজা-বাদশাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যারা কখনও উন্নতি-অবনতির বড় হোতা, ভাঙ্গা-গড়ার অগ্রজ নেতা ছিল।' 'ধ্বংসশীল দুনিয়ার সাথে আলিঙ্গনকারী হে মানুষ, যে দুনিয়ায় তুমি আজ সকালে কোথাও আছ তো সন্ধ্যাবেলা অন্য কোথাও।' 'কেন তুমি দুনিয়ার সাথে আলিঙ্গন করা বর্জন কর না। তবে তো তুমি জান্নাতুল-ফেরদাউসে আজনম কুমারী হূরদের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবার সৌভাগ্য লাভ করতে। 'তুমি যদি জান্নাতুল-খুল্‌দের

চির-অধিবাসী হবার আশা পোষণ কর তাহলে জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হওয়া তোমার উচিত হবে না।'

হযরত আবূ-উমামা বাহেলী (রহঃ) বলেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবী হিসাবে আবির্ভূত হলেন, ইবলীসের লশকরেরা তার নিকট আগমন করে আরজ করলো, হুযূর, একজন নবী এসেছেন, নতুন এক উম্মতের আবির্ভাব হয়েছে। ইবলীস বলল, তারা দুনিয়াকে মহব্বত করে? লশকরেরা বলল, জ্বী হাঁ। ইবলীস বলল, তারা যদি দুনিয়াকে মহব্বত করে তবে মূর্তি পূজা না করলেও আমার কোন পরোয়া নাই। আমি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তিনটি বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে তৎপরতা চালাবো ঃ না-হক মাল উপার্জন ও ভক্ষণ করা, না-হক পথে খরচ করা, হক ও ন্যায়সঙ্গত পথে খরচ না করা। এ তিনটি বিষয়ই সকল অপকর্মের উৎস।

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাযিঃ)-কে বলল, হে আমীরুল-মু'মিনীন! আমাদেরকে দুনিয়া সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, এমন ঘর সম্পর্কে আমি কি বলবো? যার সুস্থ ব্যক্তিরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, যারা সেখানে নিশ্চিন্ত থাকে তাদের লজ্জিত হতে হয়, যারা অভাবগ্রস্ত থাকে তাদের পেরেশান হতে হয়, আর যারা ধনী ও স্বনির্ভর তারা বহু সমস্যায় জর্জরিত। দুনিয়ার হালালেরও হিসাব হবে, হারামের জন্য আযাব হবে, সন্দেহযুক্ত মালের জন্যও শাসানো হবে। আর একবার তাঁকে দুনিয়ার পরিচয় দিতে বলা হলে তিনি বললেন, সংক্ষেপে বলবো না বিস্তারিতভাবে? উত্তর এলো, সংক্ষেপেই বলুন। অতঃপর তিনি বললেন, এর হালালেরও হিসাব হবে এবং হারামের জন্য আযাব হবে।

মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ) বলেন, এই যাদুকারিণী দুনিয়া হতে সাবধান থাক, সে আলেমদের অন্তরেও তার যাদুর প্রভাব বিস্তার করে।

আবূ-সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, 'অন্তরে যদি আখেরাত থাকে তবে দুনিয়া তার বিরুদ্ধে লড়তে আসে। আর অন্তরে যদি দুনিয়া থাকে তবে আখেরাত তার মোকাবেলায় আসে না। কারণ, 'আখেরাত' ভদ্র আর দুনিয়া হচ্ছে কমীন ও অভদ্র।' কি সাংঘাতিক কথা? ছাইয়ার ইবনুল-হাকাম (রহঃ) আরও সাফ করে বলেছেন ঃ দুনিয়া আখেরাত উভয়ই অন্তরমাঝে

একত্রিত হয়। অতঃপর একটি বিজয়ী হলে আর একটি তার অনুগত দাসে পরিণত হয়।

মালেক ইব্নে দীনার (রহঃ) বলেছেন, 'তুমি যে পরিমাণ দুনিয়ার চিন্তায় পড়বে, সেই পরিমাণ আখেরাতের চিন্তা তোমার দিল হতে বের হয়ে যাবে। আসলে এটি হযরত আলী (রাযিঃ)-এর কথারই ভিন্ন অভিব্যক্তি। তিনি বলেছেন, দুনিয়া ও আখেরাত হলো জোড়া-সতীন। যে পরিমাণ একজনের প্রতি সন্তুষ্ট হবে, সেই পরিমাণ আর একজন থেকে বঞ্চিত হবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি এমন লোকদের দেখেছি যাদের চোখে এই দুনিয়া দু'পায়ে দলিত মাটির চেয়েও তুচ্ছ ছিল। তারা চিন্তাও করতেন না যে, দুনিয়া নামক সূর্যটা উদয় হলো না অস্ত গেলো। এদিকে এলো না সেদিকে গেলো।

এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে বললো, আল্লাহ্ পাক এক ব্যক্তিকে সম্পদশালী করেছেন। সে ঐ সম্পদ হতে দান-খয়রাত করে, আত্মীয়-স্বজনকেও দেয়। এ অবস্থায় এ সম্পদ দিয়ে সুখের জীবন-যাপন কি তার জন্য উচিত হবে? তিনি বললেন, না। সে যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক হয় তবুও জীবন রক্ষার পরিমাণই সে খরচ করবে। বাকী সব তার 'অভাবের দিনের' ক্বিয়ামতের জন্য জমা করবে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, দুনিয়াকে যদি অত্যন্ত সজ্জিত-সুশোভিত করেও আমার কাছে পেশ করা হয় এবং তা পুরাপুরি হালালও হয়, এমনকি আখেরাতে এর কোন হিসাবও না নেওয়া হয় তবুও আমি তাকে তদ্রূপ ঘৃণা করবো যেরূপ তোমরা কোন মুর্দা জানোয়ারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঘৃণায় নাক চেপে ধর এবং কাপড় বাঁচিয়ে দ্রুত সরে যাও।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাযিঃ) যখন শাম দেশে গমন করলেন, হযরত আবূ উবাইদাহ্ ইব্নুল জার্রাহ্ (রাযিঃ) তাঁকে এগিয়ে নিতে এলেন। তিনি একটি উটের উপর সওয়ার ছিলেন যার লাগাম ছিল একটি রশি। অতঃপর তাঁদের মধ্যে সালাম-কালাম ও কুশল বিনিময় শেষে তিনি হযরত আবূ উবাইদার গৃহে তশরীফ নিলেন। ঘরের ভিতর একটি তলোয়ার, একখানা ঢাল ও একটি হাওদা ছাড়া আর কোন সামানই তিনি পেলেন না। বললেন, হে আবূ উবাইদাহ্! কিছু সামানও তো তৈরী করে নিতে

পারতে ; ভাল হতো না? আবু উবাইদাহ্ (রাযিঃ) বললেন, হে আমীরুল-মু'মিনীন, সেই নিদ্রালয় (কবর) পর্যন্ত এ' দিয়েই আমি পৌঁছতে পারবো।

হযরত সুফ্ইয়ান (রহঃ) বলেন, তোমার দেহের খোরাক দুনিয়া থেকে গ্রহণ কর, আর অন্তরের খোরাক আখেরাত হতে গ্রহণ কর।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম, বনী ইসরাঈল যে আল্লাহ্র উপর আবার মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছিল তার একমাত্র কারণ ছিল দুনিয়ার মহব্বত।

হযরত ওয়াহ্ব (রহঃ) বলেন, আমি কোন কিতাবে পড়েছি যে, দুনিয়া জ্ঞানীদের জন্য গণীমত, জাহেলদের জন্য গাফলতের সামান, দুনিয়া হতে বের না হওয়া পর্যন্ত তারা দুনিয়াকে চিনতে পারে না। সেদিন বুঝবে এবং আবার দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে, কিন্তু তা আর হবে না।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! যেদিন তুমি দুনিয়াতে এসেছ সেদিন থেকেই দুনিয়াকে পিছনে ফেলতে শুরু করেছ এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছ। তাই, যে ঘরের দিকে তুমি অগ্রসর হচ্ছ সে ঘর তোমার নিকটবর্তী। আর দুনিয়ার ঘর সেই তুলনায় অবশ্যই দূরবর্তী। (কথাটা মনে রেখো, ধ্যানে রেখো)।

সাঈদ ইব্নে মাসঊদ (রহঃ) বলেন, যখন দেখতে পাও যে, কোন বান্দার দুনিয়া বেড়ে যাচ্ছে ও আখেরাত কমে যাচ্ছে আর সে এতে সন্তুষ্ট—বুঝবে যে, সে ধোকায় পড়েছে, অজ্ঞাতসারে আপন চেহারাকেই সে খেলার বস্তু বানিয়েছে।

হযরত আমর ইবনুল-আছ্ (রাযিঃ) একবার মিম্বরে বসে বলেন, আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিসকে বর্জন করে চলেছেন সে জিনিসের প্রতি তোমাদের মত এত মদমত্ত হতে আর কাউকে দেখিনি। তাঁর উপর তিনটি দিনও কখনও এভাবে অতিবাহিত হয়নি যখন সুখের চাইতে কষ্টের মাত্রা বেশী ছিল না।

হযরত হাসান (রহঃ) একদা এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا قف

'দুনিয়ার জিন্দেগী তোমাদের যেন ধোকাগ্রস্ত না করে।'

(লুকমান ঃ ৩৩ ঃ)

অতঃপর তিনি বললেন, যে-ব্যক্তি দুনিয়ার কথা বলে, তাকে বল যে, কে এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন? এবং কে সে সম্পর্কে অধিক জানেন? সাবধান, দুনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ো না। দুনিয়ার ব্যস্ততার কোন সীমা নাই। যে ব্যক্তি দুনিয়াবী ব্যস্ততার এক দরজা খুলবে, সে একটিই তাকে আরও দশটির দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

মিসকীন ইব্‌নে আদম (রহঃ) বলেছেন, মানুষ এমন ঘর নিয়ে খুশী যার হালালেরও হিসাব দিতে হবে, হারামের জন্য আযাব ভুগতে হবে। হালালভাবে ব্যবহার করলে হিসাব, আর হারামভাবে ব্যবহার করলে আযাব। আদম সন্তান তার মালকে কম মনে করে, অথচ আমলকে কম বলে ভাবে না। তার দ্বীনের বিপর্যয় ঘটলে সে আনন্দ করে আর দুনিয়ার ক্ষতি হলে অস্থির হয়ে যায়।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ)-কে এক পত্রে লিখেছেন ঃ 'সালামুন্ আলাইকা। যাদের মৃত্যুর ফয়সালা হয়েছে, মনে হয় আপনিই তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি এবং মনে হয় আপনি মরেও গেছেন।' জবাবে হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) লিখছেন ঃ 'সালামুন আলাইকা। মনে হয় দুনিয়াতে থেকেও আপনি দুনিয়াতে নাই। আপনি যেন সর্বদা আখেরাতেই বাস করছেন।'

ফুযাইল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, দুনিয়াতে প্রবেশ করা (লিপ্ত হওয়া) সহজ, কিন্তু বের হওয়া কঠিন।

এক বুযুর্গ বলেন, সেই ব্যক্তিকে দেখে আশ্চর্য লাগে যে জাহান্নামকে জানে, বিশ্বাস করে, তারপরও কিভাবে হাসতে পারে? আশ্চর্য! যে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের হাজারো চড়াই-উৎরাই দেখতে পেয়েও দুনিয়াতে মন লাগাচ্ছে। আশ্চর্য! যে তকদীরকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, কিভাবে সে শান্ত ও স্তিমিত হয়ে যেতে পারে?

নাজ্‌রান নিবাসী দুই শ' বছর বয়সের এক ব্যক্তি হযরত মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট আগমন করলো। তিনি বললেন, দুনিয়াকে তুমি কেমন পেলে? সে বললো, কয়েক বছর দুঃখের, আর কয়েক বছর সুখের।

আজ সুখ তো কাল দুঃখ। এ রাতে সুখ তো সে রাতে শোক। একদিকে কোন সন্তান জন্ম হয়, আর একদিকে কারও মৃত্যু হয়। যদি সন্তান জন্ম না হতো তবে মানুষের অস্তিত্বও ধ্বংস হয়ে যেত। আর মৃত্যু যদি না হতো তবে পৃথিবী তার বাসীন্দাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যেত। হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ) বললেন, তোমার যা কিছু ইচ্ছা হয়, চাইতে পার। সে বললো, যে জীবন শেষ হয়ে গেল তা ফিরিয়ে দিবেন এবং মৃত্যু এলে তার প্রতিরোধ করবেন? তিনি বললেন, এর মালিক তো আমি নই। লোকটি বললো, তা'হলে আপনার কাছে আমার কোন দরকারও নাই।

দাউদ ত্বাঈ (রহঃ) বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার আশা পুরা হয়েছে দেখে তুমি আনন্দে আত্মহারা, অথচ এ আশা পুরণের জন্য পুরা জিন্দেগী শেষ করেছ। আর আজ কাল ক'রে আমলের ক্ষেত্রে নিজেকে ফাঁকি দিয়েছ, মনে হয় যেন আমল করে তাতে তোমার না হয়ে বরং অন্য কারুর লাভ হতো।

হযরত বিশ্‌র (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়ার দরখাস্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দীর্ঘ হিসাব গ্রহণেরই আবেদন করে।

আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার যেকোন বস্তু তোমাকে আনন্দিত করে, আল্লাহ্ পাক সেই সাথে এমন কোন কিছু অবশ্যই যুক্ত রেখেছেন যা তোমাকে ব্যথিত করবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আদম সন্তানের যখন রূহ্ বের হয় তখন তার মনে তিনটি আক্ষেপ থাকে ঃ যা কিছু জমা করলাম, প্রাণভরে তা ভোগ করতে পারলাম না ; আমার যা আশা ছিল তা তো পূর্ণ হলো না ; আজ যে পথে যাত্রা করেছি সে পথের উপযুক্ত সম্বলও আমি যোগাড় করি নাই।

আবূ সুলাইমান (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার মোহজাল হতে একমাত্র সে ব্যক্তিই পরিত্রাণ পেতে পারে যার অন্তরে এমন দৌলত আছে যা তাকে আখেরাতের কাজে মশগুল রাখে।

মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ) বলেন, আমরা যেন দুনিয়াকে ভালবাসার সমঝোতা করে নিয়েছি। সেজন্যই আমরা একে অন্যকে সৎকাজের দিকে

ডাকি না, অন্যায় থেকে বারণ করি না। এই অবস্থায় আল্লাহ্ কিন্তু আমাদের এভাবে ছেড়ে দিবেন না। হায়, নাজানি আল্লাহ্ আমাদের উপর কোন্ আযাব নাযিল করে বসেন!

আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন ঃ 'দুনিয়ার সামান্য অংশও আখেরাতের বিপুল নে'আমত হতে বঞ্চিত করে দেয়।'

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, দুনিয়াকে তোমরা তুচ্ছ বিশ্বাসে তুচ্ছ করে রাখ। আল্লাহ্র শপথ, দুনিয়াকে যে তুচ্ছ জানে, দুনিয়া তার পক্ষেই অধিক মুবারক ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দার জন্য ভালোর ইচ্ছা করেন, খুশী মনে তাকে দুনিয়ার কিছু অংশ দান করেন। অতঃপর বিরত থাকেন। যখন তা শেষ হয়ে যায় তখন আবারও দান করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র চোখে তুচ্ছ গণ্য হয়, আল্লাহ্ পাক তার হাতে দুনিয়ার বিপুল পরিমাণ ছেড়ে দেন।

মুহাম্মদ ইব্নে মুন্কাদির (রহঃ) বলেন, কেউ যদি সারা বছর রোযা রাখে, সারা রাত্র বিনিদ্র ইবাদত করে, সমস্ত মাল সদ্কা করে দেয়, আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করে এবং সকল হারাম জিনিস থেকে দূরে থাকে ; কিন্তু কাল ক্বিয়ামতে যদি তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, আল্লাহ্ পাক যে জিনিসকে তুচ্ছ জেনেছেন, এই ব্যক্তি তাকে বড় জেনেছে এবং আল্লাহ্র নজরে যা বড় ছিল, এই ব্যক্তির চোখে তা তুচ্ছ ছিল, তা' হলে তার কি অবস্থা হবে? আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে দুনিয়াকে বড় মনে করে না? তদুপরি কত যে পাপেরও আসামী।

আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার কাজও কষ্টকর, আখেরাতের কাজও কষ্টকর। কিন্তু আখেরাতের কাজে তুমি কোন সহযোগী পাবে না। আর দুনিয়ার যে কোন বিষয়ে হাত বাড়ালেই দেখতে পাবে কোন না কোন বদ্কার তোমার আগেই তাতে লিপ্ত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়াটা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত মোশকের মত ; যেদিন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে চিৎকার করছে ঃ হে রব্ব, হে মাবুদ, আপনি আমায় কেন ঘৃণা করেন? আর আল্লাহ্ পাক জবাবে বলেন ঃ হে নালায়েক, চুপ কর।

আবদুল্লাহ্ ইব্নে মুবারক (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার মহব্বত ও পাপের উৎসাহ যার অন্তরকে ঘিরে রেখেছে, ভালাই তার কাছে কিভাবে পৌছতে পারে?

ওয়াহ্ব ইব্নে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ 'দুনিয়ার কোন সামান্য ব্যাপারেও যার অন্তরে ফূর্তি অনুভব হয় তার হিকমত ও জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ। আর যে ব্যক্তি কু-প্রবৃত্তিকে দু' পায়ে দলিত করে, শয়তান তার ছায়া দেখলেও ভয় পায়। যার ইল্ম তার কু-প্রবৃত্তিকে পরাজিত করে সে-ই সত্যিকার বিজয়ী।'

বিশ্‌রে হাফী (রহঃ)-কে সংবাদ বলা হলো যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। তিনি বললেন, হাঁ, দুনিয়া জমা করে অবশেষে আখেরাতে পাড়ি দিতে হয়েছে। জীবনটাকে বরবাদ করেছে। কেউ বললো, হুযুর, সেতো বহু ইবাদত ও বহু নেক কাজ করতো। তিনি বললেন, একদিকে দুনিয়া জমা করা, আর একদিকে ইবাদত করা—এতে কি ফল হবে?

জনৈক বুযুর্গ বলেন, দুনিয়া আমাদের সম্মুখে নিজেই নিজেকে ঘৃণারূপে পেশ করে, তবু আমরা তার প্রেমে পড়ি। যদি প্রিয় ও সুন্দররূপে পেশ করতো তা' হলে আমাদের কি অবস্থা যে হতো!

জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, দুনিয়া কার জন্য? তিনি বললেন, তার জন্য যে তাকে বর্জন করে। প্রশ্ন করা হলো, আখেরাত কার জন্য? বললেন, যে আখেরাত তালাশ করে।

আরেক জ্ঞানী বলেছেন, দুনিয়া বিরান ঘর। তদপেক্ষা অধিক বিরান ঐ ব্যক্তির দিল্ যে দুনিয়াকে আবাদ করে। আর আখেরাত আবাদ ও সুন্দর ঘর। তদপেক্ষা বেশী আবাদ ও সুন্দর ঐ ব্যক্তির দিল্ যে আখেরাত তালাশ করে।

জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ছিলেন সেই খোদা-প্রেমিকদের শ্রেণীভুক্ত যাঁরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র মুখপাত্র হয়ে কথা বলেন। তিনি তাঁর এক দ্বীনি ভাইকে উপদেশ দান ও ভীতি প্রদর্শন করে বলেছিলেন, হে আমার ভাই! দুনিয়া পদস্খলনের স্থান, অপমানের জায়গা, এর সকল প্রাসাদ ও আবাদী একদিন ধ্বংস হবে, এর বাসিন্দারা একদিন কবরে যাবে, এখানকার যেকোন ঐক্যের ভাঙ্গন অনিবার্য, এর অর্থ-বিত্ত

সব হারিয়ে একদিন কাঙ্গাল হতেই হবে, এর পরিমাণ অধিক হওয়াতেই বিপদ ও অশান্তি, এখানে অভাব-অনটনের মধ্যেই রয়েছে শান্তি। অতএব, কালবিলম্ব না করে আল্লাহ্‌র দিকে ছুট, আল্লাহ্‌র দেওয়া হিস্যার উপর খুশী থাক। ক্ষণস্থায়ী ঠিকানার পেরেশানীতে পড়ে চিরস্থায়ী বাড়ীর কথা ভুলে যেও না। কারণ, এ জীবন একটা ছায়া যা কিছুক্ষণ পর বিলীন হবেই ; এ জীবন একটা দেওয়াল যা ভেঙ্গে পড়বেই। তাই, আমল বেশী কর, আশা কম কর।

হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আদ্‌হাম (রহঃ) এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কাছে স্বপ্নের এক দিরহাম বেশী প্রিয়, না জাগ্রত অবস্থার এক দীনার? সে বললো, জাগ্রত অবস্থার এক দীনার। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, দুনিয়ার যে বস্তুকে ভালবাসছ, তা যেন ঘুমন্ত অবস্থায় ভালবাসছ। আর আখেরাতের যা-কিছু তুমি উপেক্ষা করছ তা যেন জাগ্রত অবস্থায় উপেক্ষা করছ।

ইসমাঈল বিন আইয়াশ (রহঃ) বলেন, আমাদের খোদা-প্রেমিক মনীষীগণ দুনিয়াকে 'শূকর' বলে আখ্যায়িত করে বলতেন, হে শূকর, আমাদের কাছ হতে দূরে সর। তারা যদি আরও কোন নিকৃষ্ট নাম পেতেন তবে সেই নামে তাকে অভিহিত করতেন।

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়ার প্রতি তোমরা এত বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়বে যে, অবশেষে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের পূজা করবে।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মু'আয আর-রাযী(রহঃ) বলেন, জ্ঞানী তিন প্রকার ঃ এক, যে দুনিয়াকে বর্জন করে দুনিয়া তাকে বর্জন করার আগে ; দুই, যে কবর তৈরী করে রাখে কবরে প্রবেশের আগে (অর্থাৎ যে নিজেকে মৃত মনে করে কবরবাসীর মত জীবন-যাপন করে।) এবং তিন, যে তার সৃষ্টিকর্তাকে খুশী করে দেয় তার সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ার আগে। তিনি আরও বলেন, দুনিয়া তার নিকৃষ্টতা ও অপকারিতার চরমে পৌঁছেছে। তাই, দুনিয়ার প্রতি কামনা-বাসনাও তোমাকে আল্লাহ্‌র বন্দেগী থেকে গাফেল করে দিবে। আর দুনিয়াতে যদি লিপ্ত হয়ে পড়, বল—তখন কি ভয়াবহ অবস্থা হবে।

বকর বিন আবদুল্লাহ্‌ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাহায্যে দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকতে চায়, সে যেন শুক্‌না খড়কুটা দ্বারা আগুন নিভাতে

চেষ্টা করছে।

হযরত বুন্‌দার (রহঃ) বলেন, দুনিয়াদারদেরকে যখন দুনিয়া ত্যাগের আলোচনা করতে দেখ, বুঝবে যে, ওরা শয়তানের বিদ্রূপাত্মক কাণ্ডে মেতেছে। তিনি বলেন, যে দুনিয়ার দিকে অগ্রসর হবে, দুনিয়ার লেলিহান শিখা তাকে পুড়ে শেষ করবে—অর্থাৎ লোভ-লালসা তাকে ধ্বংস করবে। এমনকি, সে ভস্মস্তূপে পরিণত হবে। আর যে আখেরাতের দিকে অগ্রসর হবে, আখেরাতের আগুন তাকে সেই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সোনার মত করে দিবে যদ্দ্বারা সমূহ কল্যাণ সাধিত হয়। আর যে আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হবে, তাওহীদের আগুন তাকে সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দিবে। ফলে, সে এমন হীরা-জওহারে পরিণত হবে যার দাম অসীম, কল্পনাতীত।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়া বলতে মাত্র ছয়টি বস্তু ঃ খাদ্য, পানীয়, পোশাক, সওয়ারী, বিবাহ ও সুগন্ধ। সর্বোত্তম খাদ্য মধু, অথচ সেই মধু হলো মাছির খোরাক এবং মাছির ঝুটা। সর্বোৎকৃষ্ট পানীয় বস্তু পানি। সেই পানিতে সৎ-অসৎ সকলের সমান অধিকার। সবচেয়ে উত্তম পোশাক রেশম। তা' হলো পোকাদের লালার তৈরী। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সওয়ারী ঘোড়া। সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে মানুষ হত্যা করা হয়। বিবাহের প্রধান বিষয় স্ত্রী, প্রস্রাবের দরজার ভিতর দিয়ে প্রস্রাবের ভাণ্ড লাভই যার সার কথা। মেয়েরা নিজেদের যত উৎকৃষ্টভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখুক না কেন, তাদের থেকে নিকৃষ্ট বস্তুই হয় উদ্দেশ্য। আর সবচেয়ে উত্তম খোশবু মেশক। সেই মেশকের হাকীকত হচ্ছে রক্ত।